নবীন বিজ্ঞানী

ত্রৈমাসিক জনপ্রিয় বিজ্ঞান পত্রিকা
প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

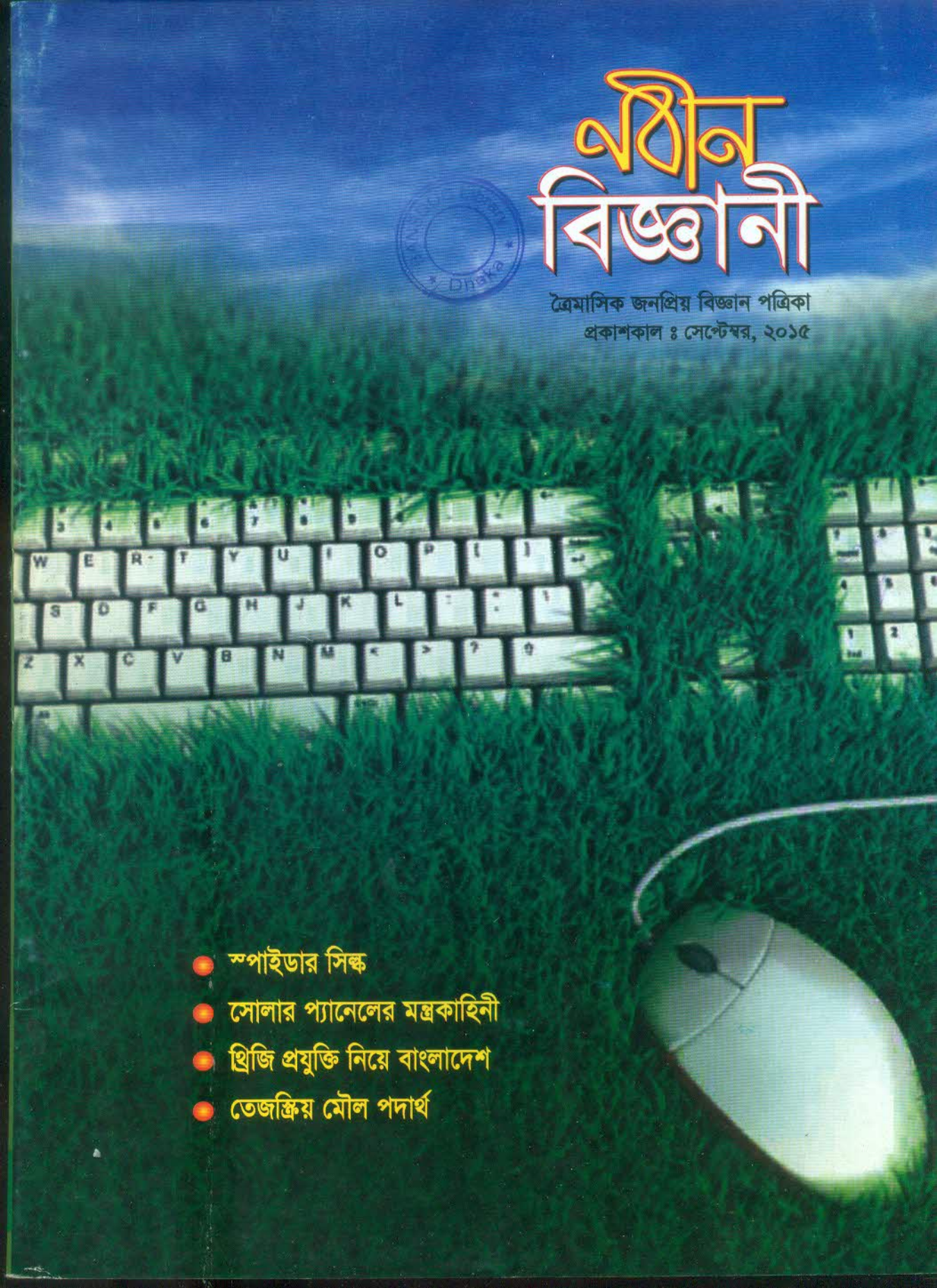

- স্পাইডার সিল্ক
- সোলার প্যানেলের মন্ত্রকাহিনী
- থ্রিজি প্রযুক্তি নিয়ে বাংলাদেশ
- তেজস্ক্রিয় মৌল পদার্থ

নবীন বিজ্ঞানী

ত্রৈমাসিক জনপ্রিয় বিজ্ঞান পত্রিকা

প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

Dhaka

মহাপরিচালকের দপ্তর

☐ প্রশাসনিক কর্মকর্তা ☐ হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
☐ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
☐ ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা ☐ গ্রন্থাগারিক
ডায়েরী নং তারিখঃ

মহাপরিচালক

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি :
জনাব স্বপন কুমার রায়
মহাপরিচালক

সম্পাদকমণ্ডলী :
কাজী হাসিবুদ্দীন আহমেদ
কিউরেটর (সার্বিক)
জনাব মোঃ মোহসীন মোল্লা
সহকারী কিউরেটর
জনাব আফছানা শারমিন
সহকারী কিউরেটর
জনাব শ্যামল বসাক
সিনিয়র আর্টিস্ট
জনাব পপি মণ্ডল
সহকারী লাইব্রেরিয়ান-কাম-ক্যাটালগার

প্রচ্ছদ :
জনাব শ্যামল বসাক

সহযোগিতায় :
জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম

অঙ্গ সজ্জা :
জনাব মোঃ জিয়াউদ্দিন

প্রকাশনায় :
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

যোগাযোগের ঠিকানা :
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৯১১২০৮৪
ই-মেইল : infonmst@gmail.com

সূচীপত্র

শিরোনাম		লেখক	পৃষ্ঠা
► আসছে গোলআলুর জিএম জাত	:	ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূইয়া	১
► ডিজিটাল বাংলাদেশ কী এবং কেন	:	জহুরুল হক বুলবুল	৫
► হাতের কাছেই রোগমুক্তির উপশমক	:	হোসনে আরা পারভীন	৮
► বাংলাদেশে আমের চাষাবাদ, বিভিন্ন জাত ও বাহারী নামকরণ	:	কৃষিবিদ ড. মোঃ শরফ উদ্দিন	১৫
► তারা চেনার মজা	:	সৌমেন সাহা	১৮
► সোলার প্যানেলের মন্ত্রকাহিনী	:	কাজী মুহাম্মদ আরফাতুল ইসলাম	২৫
► থ্রিডি প্রযুক্তি নিয়ে বাংলাদেশ	:	মোঃ মিজানুর রহমান	২৭
► স্পাইডার সিল্ক	:	মোরছালিনা ইসলাম (কথা)	৩০
► আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময় কম্পিউটার	:	কামরুন নাহার	৩৩
► তেজস্ক্রিয় মৌল পদার্থ	:	কাজী রিচি ইসলাম	৩৬
► অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান : জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	:	মোঃ জিয়াউদ্দিন	৩৮

"নবীন বিজ্ঞানী" এর নিয়মাবলী

লেখক-লেখিকাদের জন্য

- রচনা বিজ্ঞানের যে কোন বিষয়ে হতে পারে, তবে তা যেমন নবীনদের জন্য উপযোগী হতে হবে তেমনি তার ভাষা সহজ, সরল ও আকর্ষণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার স্পষ্টাক্ষরে লিখে বা টাইপ করে সম্পাদক বরাবর পাঠাতে হবে।
- অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হবে না।
- রচনার মৌলিকত্ব বজায় রেখে অংশবিশেষ পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন বা বর্জনের অধিকার সম্পাদকের থাকবে।
- রচনা মোটামুটি দু'হাজার শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
- রচনার সাথে ছবি দিতে হলে সে সব ছবি লেখককেই সরবরাহ করতে হবে। হাতে আঁকা ছবি হলে পৃথক কাগজে সেটি সুন্দরভাবে চাইনিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে।
- ভুল তথ্য ও মতামতের জন্য লেখক দায়ী থাকবেন, সম্পাদক নয়।
- প্রকাশিত রচনার জন্য লেখককে সম্মানী দেয়ার ব্যবস্থা আছে।

সম্পাদক
"নবীন বিজ্ঞানী"
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১১২০৮৪
ই-মেইল ঃ infonmst@gmail.com
নবীন বিজ্ঞানী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে উপরোক্ত ঠিকানায় সম্পাদক-এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন

মুখবন্ধ

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল নানাবিধ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিজ্ঞানকে ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ জনগণের কাছে জনপ্রিয় করে তোলা। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বিজ্ঞানের নানা উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির বিকাশ এবং তরুণ প্রজন্মের বিজ্ঞান বিষয়ের উদ্ভাবনকে সংরক্ষণ এবং ছাত্র-ছাত্রী ও জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যেই জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর 'নবীন বিজ্ঞানী' নামে একটি ত্রৈমাসিক সাময়িকী প্রকাশ করছে।

আধুনিক যুগের অগ্রগতির মূল হাতিয়ার হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। "নবীন বিজ্ঞানী" প্রকাশনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের সেই সুনির্মল ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। "নবীন বিজ্ঞানী" এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বিজ্ঞান জগতের বিচিত্র ও বাস্তবসম্মত বিষয়সমূহ সহজ, সরল ও আকর্ষণীয় ভাষায় জ্ঞানপিপাসু মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং এর মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান সাক্ষরতা বৃদ্ধি করা এবং বিজ্ঞান চর্চায় সকলকে উদ্বুদ্ধ করা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক, জাগতিক ও অর্থনৈতিক জীবন সমৃদ্ধ ও গতিশীল হবে। প্রকাশনা একটি শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম। যদিও বাংলাদেশে এ ধরনের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকাশনার সংখ্যা খুবই কম। সমৃদ্ধ বিশ্ব বিনির্মাণে উন্নত প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের নিত্য-নতুন আবিষ্কার নিয়ে আমাদেরকেও বিশ্ব দরবারে আসীন হতে হবে। বিজ্ঞানের নানা অজানা আবিষ্কারের তথ্য ও জ্ঞান সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকাশনা। জুন '১৫ সংখ্যার পর সেপ্টেম্বর '১৫ সংখ্যা প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। সকল পাঠক ও লেখকদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় এ ধারাবাহিকতাকে অক্ষুন্ন রাখবে। "নবীন বিজ্ঞানী"র নিয়মিত প্রকাশ বিজ্ঞান মনস্ক জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করি। এ প্রকাশনা কার্যক্রমে নিয়োজিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

স্বপন কুমার রায়
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
ঢাকা

আসছে গোলআলুর জিএম জাত

– ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া

গোলআলুর সাথে বাঙালির পরিচয় বেশ অনেক দিন ধরেই। কোন সুদূর দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ইউরোপ হয়ে এদেশে এক সময় পৌঁছেছিল ছোট ছোট গোলআলুর নানারকম জাত এই দিয়ে চলেছে আমাদের গোলআলু আবাদ শত শত বছর ধরে। এদেশে ইউরোপ থেকে প্রথম আলু নিয়ে আসে ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ বণিকগণ আর বড় আলুর প্রচলন শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে। তবে ১৯৯০ সনে এসে আমরা পেয়েছি ডাউস আকৃতির নানারকম অনুমোদিত গোলআলু জাত উৎস মূলত এদের ইউরোপই। বিশেষ করে নেদারল্যান্ডের বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত গোলআলুর জাতগুলোই এদেশে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে কিছু আলুর জাত বা লাইন প্রবর্তন করা হয়েছে পেরুস্থ ইন্টারন্যাশনাল পটেটো সেন্টার থেকেও। এ দেশের জল-হাওয়া-মৃত্তিকায় এরা বেশ চমৎকারভাবে খাপখাইয়ে নিতে পেরেছে বলে এরা এখানে বাণিজ্যিকভাবে আবাদের সরকারী অনুমোদন পেয়েছে। এসব জাতগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ডায়মন্ট, কার্ডিনাল, গ্রানোলা, প্রোভেন্টা, আল্ট্রা, ডুরা, এসটারিক্স, ফেলসিনা, লেডি রোসেটা, কারেজ, মেরিডিয়ান, সাগিটা, কুইন্সি, অলমেরা, ওমেগা ইত্যাদি।

এদেশে গোলআলুর উৎপাদন দিন দিন বেড়েই চলেছে। বর্তমানে এদেশে প্রায় ৪.৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে আলুর চাষ করা হচ্ছে যা থেকে আমরা পাচ্ছি প্রায় ৮৫ লক্ষ টন আলু। হেক্টর প্রতি গড়পড়তা আলুর উৎপাদন ১৯ টনের উপর এদেশের স্থানীয় জাতগুলোর ফলন হেক্টর প্রতি ৫-৮ টন অথচ উচ্চ ফলনশীল আলু জাতগুলোর ফলন ২৫-৩৫ টন। বর্তমানে আলুর উৎপাদন আমাদের দেশে বেশ বেড়েছে। এদেশে আলুর এ উৎপাদন বৃদ্ধির কারণগুলো হলো –

- দিন দিন গোলআলুর আবাদি এলাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে অধিক এলাকায় আলুর আবাদ হচ্ছে বলে দেশে এর উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- কৃষক গোলআলুর আবাদ কৌশলটা মোটামুটি রপ্ত করতে পেরেছে বলে আলুর উৎপাদন বৃদ্ধিতে তা সহায়ক হচ্ছে।
- কৃষকের হাতে এখন গোলআলুর উন্নত জাতগুলোর বীজ আলু পৌঁছে যাবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলে কৃষক এসব জাত আবাদ করতে পারছে, ফলে ফলন বেড়ে যাচ্ছে।

আলু চাষের বড় সমস্যা হলো আলুর লেট ব্লাইট রোগ এটি একটি ছত্রাক দ্বারা সৃষ্ট আলুর প্রধান রোগ। এর জীবাণুর নাম হলো *Phytophthora Infestans*। বায়ু বাহিত রেণুস্থলীর মাধ্যমে এই ছত্রাকটি ছড়িয়ে থাকে নতুন আক্রান্ত পাতায় রেণুস্থলী আশ্রয় পাবার সাথে সাথে এদের মধ্যে বাহিত রেণু এক একটি চলনশীল স্পোরে পরিণত হয় এবং পত্ররন্ধ্র দিয়ে ঢুকে যায় ভেতরে। অতঃপর যথাসময়ে অঙ্কুরিত হয়ে ঘটায় রোগ সংক্রমণ। আক্রান্ত টিস্যু দ্রুতই মরে যায় এবং ছত্রাক ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র পাতা জুড়ে, ঝলসে দিয়ে পুরো পাতাটাকেই। দেখলে মনে হয় যেন ধ্বসে গেছে পাতাসহ গাছটিই। আর্দ্র আর মেঘযুক্ত আবহাওয়া এদের বংশ বিস্তারের জন্য বড় উত্তম পরিবেশ। আক্রমণের মাত্রা বেড়ে গেলে তা বিস্তার লাভ করে। সময়মত রোগ দমন করতে না পারলে তা ধ্বংস করে দেয় পুরো গোল আলুর মাঠটাকেই।

আমাদের দেশের আলু চাষের খরচের একটি বড় অংশ ব্যয় হয় লেট ব্লাইট রোগ দমনের পেছনে। এর জন্য কৃষককে আলুর মাঠে স্প্রে করতে হয় নানারকম রাসায়নিক ছত্রাকনাশক। কখনো এমন হয় যে, কৃষক

ফসলকে এই রোগের প্রকোপ থেকে রক্ষা করার জন্য একাধিক ঔষধ একত্রে মিশিয়ে গোলআলুর মাঠে প্রয়োগ করে থাকে। এত ভিন্ন ভিন্ন সব রাসায়নিক পদার্থ মাঠে কৃষক প্রয়োগ করতে বাধ্য হন যে, এদের কোন কোনটা দীর্ঘ মেয়াদে আলুর ভেতরও জমা হবার ক্ষমতা রাখে। তাছাড়া বালাইনাশক সবসময়ই জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ। পরিবেশ দূষণের অন্যতম উপকরণ এরা। ফসলকে লেট ব্লাইট রোগ থেকে বাঁচাবার জন্য ঔষধ ছিটিয়ে দেবার সময় একথা প্রায়শই বিস্মৃত হন কৃষক।

জিন প্রযুক্তির বিকাশের ফলে বিজ্ঞানীদের মাথায় গোলআলুর লেট ব্লাইট প্রতিরোধী জাত সৃষ্টি করার ভাবনাটা অনিবার্যভাবে চলে আসে। বিজ্ঞানীরা অনেকদিন ধরেই লক্ষ্য করছিলেন যে, গোলআলুর একটু দূর আত্মীয় প্রজাতি *Solanum Venturi*-তে লেট ব্লাইট রোগ কোন ক্ষতি করতে পারে না। বুনো পরিবেশে অক্ষত অবস্থায় এই রোগটিকে এরা বেশ ভালভাবে প্রতিহত করতে পারে। এরকম পর্যবেক্ষণ থেকে শুরু হলো গোলআলুর এই বুনো আত্মীয়ের কোন ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট কোন জিন এ জন্য দায়ী একে খোঁজে বের করার কাজ। বিজ্ঞানীরা একসময় তেমন জিনের সন্ধানও পেয়ে যান। এবার বুনো প্রজাতি থেকে আলাদা করে নেয়া হয় জিনটিকে। আবাদি গোলআলুতে জিনটিক সংযোজন করার কাজে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে আসে USAID। সেটি ২০০৫ সনের কথা। ইন্দোনেশিয়ার জাভাতে অবস্থিত লেমবাং হর্টিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে লেট ব্লাইট প্রতিরোধী RB জিন বুনো গোলআলু থেকে আলাদা এবং কিছুটা রূপান্তর করে নিয়ে সংযোজন করা হয় সেখানকার Katahdin নামক একটি আলুর জাতে। অতঃপর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)-এর বিজ্ঞানীরা Katahdin জাতের সাথে বাংলাদেশে অবমুক্ত দু'টি গোলআলু জাত – কার্ডিনাল ও ডায়মন্ট-এর সংকরায়ন করে নেয়। সংকরায়নের ফলে RB জিন সমৃদ্ধ Katahdin জাত থেকে হাইব্রিড বীজে চলে আসে RB জিনসহ শতকরা ৫০ ভাগ জিন আর আমাদের ডায়মন্ট বা কার্ডিনাল থেকে চলে আসে শতকরা ৫০ ভাগ জিন। অর্থাৎ সংকরায়নে ব্যবহৃত দুটি জাতের অর্ধেক সংখ্যক জিন হাইব্রিডে এসে জমা হয়। এছাড়াও বিএআরআই প্রদত্ত তথ্য মতে ২০০৭ সনে যুক্তরাষ্ট্রের Wisconsin University-তে বাংলাদেশ থেকে পাঠানো হয় কার্ডিনাল ও ডায়মন্ট জাত দু'টো। সেখানকার গবেষকগণ এ দু'টি আলুর মধ্যে জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে সরাসরি RB জিন সংযোজন করে দেন। বিএআরআই বিজ্ঞানীরা দু'জায়গা থেকে প্রাপ্ত এসব জিএম আলু নিয়ে শুরু করেন এদের বংশ বৃদ্ধি এবং ২০০৮-০৯ সনে স্বল্প আকারে জয়দেবপুর এবং দেবীগঞ্জে জিএম আলুর নিয়ন্ত্রিত মাঠ পরীক্ষা শুরু করেন। প্রথম দিকের পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজগুলো ততটা সুবিন্যস্তভাবে করা সম্ভব হয়েছে তা বলা যাবে না। তবে প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, বুনো গোলআলু জাতের রোগ প্রতিরোধী জিন লাভ করায় জিএম গাছগুলো সাধারণ জাতগুলো অপেক্ষা অনেকটাই লেট ব্লাইট রোগ মুক্ত। পরবর্তী পরীক্ষা নিরীক্ষাতেও এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, এরা লেট ব্লাইট রোগ প্রতিরোধী। এখন চলছে শেষ পর্যায়ের পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ। আগামীতে কোন একসময় লেট ব্লাইট প্রতিরোধী জিএম জাত অবমুক্তির জন্য প্রক্রিয়াকরণ করা হবে এমনটি অনুমান করা চলে।

আমাদের এ কথাটি মনে রাখতে হবে যে, দু'টি উৎস থেকে পাওয়া জিএম জাতগুলোর জেনেটিক গঠন বা জিনের গঠন কিন্তু একরকম নয়। ইন্দোনেশিয়া থেকে পাওয়া হাইব্রিড জিএম আলুতে উভয় পেরেন্টের জিন রয়েছে বলে এরা আর ডায়মন্ট বা কার্ডিনাল থাকলোনা। বুনো আলুর RB জিনসহ এরা নতুনরকম আলু হিসেবে আবির্ভূত হলো। এদের বংশবিস্তার করে ডায়মন্ট বা কার্ডিনাল বলে অভিহিত করার কোন সুযোগও থাকলো না। দু'টি ভিন্ন জাতের জিন বংশধরে এসে একত্রিত হওয়ায় এরা আর ডায়মন্টও নয় আবার এরা কার্ডিনালও নয়। এমনকি এরা ইন্দোনেশিয়ার জাত KatahdinIও নয়। দেশে বিদ্যমান অন্যান্য

জাত অপেক্ষা এরা অধিক ফলনশীল আর গুণগত মানসম্পন্ন হলে সম্পূর্ণ নতুন নামে এদের মাঠে অবমুক্তির জন্য প্রক্রিয়াকরণ করতে হয়। তবে এসব জিএম জাতের নাম জিএম ডায়মন্ট বা জিএম কার্ডিনাল দিতে হলে এদের প্রতিটির সাথে আলাদা আলাদাভাবে চালাতে হবে সংকর জিএম হাইব্রিডটির ছয় সাত বছর ব্যাকক্রস।

যুক্তরাষ্ট্রের Wisconsin বিশ্ববিদ্যালয় থেকে RB জিন সংযোজন করে ডায়মন্ট আর কার্ডিনাল জাতটিতে কেবল RB জিনটিই নতুন করে যুক্ত হয়েছে। এখানে ডায়মন্ট আর কার্ডিনাল জাত দু'টিতে কিন্তু RB জিন ছাড়া জাত দু'টি আগের মতই রয়েছে। ফলে এ দু'টি জিএম আলুর জাত চূড়ান্ত পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে এদের নতুন নামে বা জিএম ডায়মন্ট এবং জিএম কার্ডিনাল নামে অবমুক্ত করা যাবে। মোট কথা হলো দু'টি উৎস থেকে পাওয়া জিএম গোলআলুর জিনের গঠন একেবারেই এক নয়। বাস্তবে যখন এসব জিএম আলু গাছ পরীক্ষার জন্য মাঠে লাগানো হয় দুটি উৎসের জিএম আলুই কিন্তু লেট ব্লাইট প্রতিরোধী হবে এবং বাস্তবে হচ্ছেও তা। তবে এদু'টি উৎস থেকে পাওয়া জিএম আলু আসলে জিনগত দিক থেকে যে সম্পূর্ণ ভিন্নরকম সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ নিশ্চয়ই তা মাথায় রেখেছেন।

দু'টি উৎসের জিএম আলু নিয়ে একই সময় পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে বলে সংগত কারণেই একাধিক প্রশ্ন উঠে আসছে।

- দু'টি উৎস থেকে পাওয়া জিএম আলু গাছ কি সত্যি সত্যি আলাদা করে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে ?
- দু'টি উৎসের জিএম আলুর জেনেটিক গঠন দু'রকম হওয়ায় একত্রে এদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা কতটা যুক্তিসংগত ?
- ইন্দোনেশিয়া থেকে প্রাপ্ত জিএম আলুর সাথে অবশ্যই আমাদের ডায়মন্ট এবং কার্ডিনাল জাতের সকল বৈশিষ্ট্য তথা জিন জিএম আলুতে পেতে হলে এদের সাথে ব্যাকক্রস করতে হবে এবং তা করতে হবে কমপক্ষে ছয় সাত বংশধর পর্যন্ত। এরকম কোন ব্যাকক্রস কি এক্ষেত্রে করা হয়েছে।
- ইন্দোনেশিয়ার Katahadin জাতের সাথে আমাদের দু'টি জাতের ক্রস করার মাধ্যমে প্রাপ্ত হাইব্রিড আলুর ফলনকি আমাদের কার্ডিনাল বা ডায়মন্টের চেয়ে উত্তম ?

লেট ব্লাইট প্রতিরোধী জিন সংযোজন করে আমাদের গোলআলু এই মারাত্মক রোগটির হাত থেকে রক্ষার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশকে রাসায়নিক ছত্রাকনাশকের হাত থেকে রক্ষা করার আকাঙ্খা আমাদের সকলেরই। জিন প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং প্রসার আমাদের সে কল্পনাকে আজ বাস্তবে রূপ দিতে যাচ্ছে। তাছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয় বিশেষকরে কৃষি মন্ত্রি মহোদয় জিএম ফসলকে এগিয়ে নিয়ে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করায় জিএম জাত ছাড়করণ করা বিষয়টি বেশ খানিকটা সহজতরই হবে। বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব হলো সঠিকভাবে সঠিক পদ্ধতিতে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে জিএম জাত অবমুক্ত করার পথে এগিয়ে যাওয়া।

খাদ্য ফসল হিসেবে দু'টি মাত্র আলু জাত জিএম হিসেবে অবমুক্ত করার কারণে আমাদের অর্থনীতির জন্য তা কতটা লাভজনক হবে সেটিও আমাদের ভাবতে হবে। এ ভাবনার কারণগুলো হলো –

- গোলআলুর বিএআরআই কর্তৃক অবমুক্ত অনুমোদিত জাতের সংখ্যা ৫৫টি। মাত্র দু'টি জাতে লেট ব্লাইট প্রতিরোধী RB জিন সংযোজন করে পাওয়া জিএম জাত দিয়ে কি আমরা অন্যসকল আলুর জাতকে প্রতিস্থাপন করতে যাচ্ছি ?
- বর্তমানে এ দু'টি জাত সর্বাধিক আবাদ হচ্ছে এদেশে। এ দু'টি জাতের আলুর আকৃতি ও গুণাগুণ

প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানীযোগ্য নয়। অথচ জিএম জাত আবাদের মাধ্যমে অরপ্তানীযোগ্য ও অপক্রিয়াজাতযোগ্য আলুর উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে আমরা কি আলু নিয়ে মহা বিপদে পড়বোনা ?

- আলু উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে আমরা আলু রপ্তানি বাড়াতে চাই। ডায়ামন্ট এবং কার্ডিনাল জাত দু'টি কিন্তু রপ্তানীযোগ্য আলু নয়। জিএম জাত হিসেবে দু'টি জাত অবমুক্ত করা হলে এদের আবাদ এলাকা এবং উৎপাদন বেড়ে যাবে বলে জিএম আলু কি রপ্তানী করা সম্ভব হবে ? জিএম আলু জাত অবমুক্ত করা হলে আলু রপ্তানীর উপর তা কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা ভাবতে হবে আমাদের সেটিও।

জিএম আলু রোগ প্রতিরোধী তা মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে বেশ স্পষ্ট। তবে এসব জিএম জাত অবমুক্তির অর্থনৈতিক দিকটি কিন্তু আমাদের ভেবে দেখতে হবে আমাদের স্বার্থেই। আলুর উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হলে আমাদের রপ্তানি বাড়াবার কোন বিকল্প নেই। জিএম জাতের আবাদ সে রপ্তানির পথে কোন বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে কিনা সেটি আমাদের আগে ভাগেই ভেবে নিতে হবে।

ফসলের জিএম জাত নিয়ে অনেকের মনেই অনেক প্রশ্ন অনেক আশংকা রয়েছে। আর সে ফসল যদি কোন খাদ্য শস্য হয় তাহলেতো কোন কথাই নেই। আমাদের দেশে ইতোমধ্যে বিটি জিন সমৃদ্ধ বেগুনের জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। অল্প কয়েকজন চাষী সেসব জিএম বেগুন আবাদও শুরু করেছেন। এসব জিএম বেগুন জাত নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে নানা কথাও উঠে আসছে। জিএম গোলআলু নিয়েও হয়তো কথা উঠতে পারে। তবে গোলআলু এবারকার জিএম জাতগুলোর সুবিধার কথা এই যে, এক্ষেত্রে কাঙ্খিত জিনটি আনা হয়েছে আর একটি গোলআলুর প্রজাতি থেকেই। ফলে এই দু'টি প্রজাতির মধ্যে জেনেটিক পার্থক্য তুলনামূলকভাবে কম। এরা একই গোত্রের অন্তর্ভূক্ত। ফলে গোলআলুর জিএম নিয়ে আপত্তি কম থাকারই কথা।

লেখক পরিচিতি : প্রফেসর, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ডিজিটাল বাংলাদেশ কী এবং কেন

– জহুরুল হক বুলবুল

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, প্রযুক্তির যুগ বা ডিজিটাল যুগ। এ কথা দেশের কোথাও না কোথাও হরহামেশাই উচ্চারিত হচ্ছে। তাই ডিজিটাল শব্দের সাথে আমরা কম-বেশি সবাই পরিচিত। ইংরেজি 'ডিজিট' শব্দের অর্থ অঙ্ক, এখানে অঙ্ক অর্থ গণিত শাস্ত্র নয়। দশমিক পদ্ধতির ০ হতে ৯ এ দশটি অঙ্ক বা বাইনারি পদ্ধতি ০ এবং ১ এ অঙ্কগুলো। আর ডিজিটের Adjective বা বিশেষণ হলো ডিজিটাল। 'ডিজিটাল বাংলাদেশের' ডিজিট শব্দের সাথে অঙ্কের বা সংখ্যার কোনো সম্পর্ক নেই। এটা নেহায়েতই একটা প্রতীকি শব্দ। ডিজিটাল বাংলাদেশ শব্দটা প্রথম শোনা গেছে ২০০৮ সালে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে। তারপর থেকে ধীরে ধীরে শব্দটা পরিচিতি পেতে পেতে এখন সবার মুখে মুখে। আসলে ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে আমরা কী বুঝি ? ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা কী ?

ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে সাধারণ মানুষ কী বোঝেন ? এ প্রশ্ন নিয়ে বিবিসি বাংলা বিভাগের প্রতিনিধি রাজধানী ঢাকা ও তার বাইরে অনেক জায়গায় ঘুরে মানুষের সাথে কথা বলেছেন। রাজধানী ঢাকার কয়েকজন এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন–ডিজিটাল বাংলাদেশ মানে তথ্যপ্রযুক্তি-ভিত্তিক সেবার এমন প্রসার ঘটানো, যাতে আগে যেসব সেবার জন্য নানা জায়গায় ছুটতে হতো তার আর দরকার হবে না–ঘরে বসেই কম্পিউটারে এবং মোবাইল ফোনে তা পাওয়া যাবে। ঢাকার বাইরের কয়েকজন বলেছেন ডিজিটাল বাংলাদেশ মানে–উন্নয়নের এমন এক ব্যবস্থা যেখানে হাতের কাছে এবং দ্রুত সেবা পাওয়া যাবে। কয়েকজন বলেছেন ডিজিটাল বাংলাদেশ মানে কী তারা জানেন না।

মোটা দাগে বললে বলা যায়–গ্রামের একটি মহিলাকে যখন মোবাইলে কথা বলতে দেখি, তখনি আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ দেখি। আর একটু পরিষ্কার করে বললে বলা যায়–ডিজিটাল বাংলাদেশ মানে প্রযুক্তি নির্ভর উন্নয়ন। অর্থাৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে গড়ে তোলা আধুনিক বাংলাদেশ। বিজ্ঞানের ফল হলো প্রযুক্তি আর প্রযুক্তি মানে হলো উন্নয়ন। আজ আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বর্তমান সমাজ হলো বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি নির্ভর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল আমরা আলো বাতাসের মতো গ্রহণ করছি। তথ্য প্রযুক্তিকে বলা হয় পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। আজ বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পৃথিবী বিপুল বেগে প্রগতির পথে এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশ বিপুল বেগে না হলেও এগিয়ে চলছে। এদেশের মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে, শিক্ষার হার বেড়েছে, মানুষের গড়পড়তা মাথা-পিছু আয় বেড়েছে, শিশু মৃত্যুর হার কমেছে, স্বাধীনতার আগে মানুষ অনাহারে-অর্ধাহারে থাকলেও স্বাধীনতার পর জনসংখ্যা দ্বিগুণের ওপরে বাড়লেও তার সঙ্গে তাল রেখে খাদ্য উৎপাদন বাড়ার ফলে মানুষের গড় পুষ্টিমান বেড়েছে। সবমিলে দেশ এগিয়েছে অনেক দূর।

কৃষিকাজে : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব কৃষি ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভূমি কর্ষণ আবশ্যকীয়। গভীরভাবে ভূমি কর্ষণ করা হলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু গরু-মহিষ চালিত কাঠের লাঙ্গলের সাহায্যে গভীরভাবে জমি চাষ সম্ভব হয় না। চাষের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর। ধান মাড়াই ও ভাঙানোর কাজে আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার হচ্ছে। সেচকার্যে, সার উৎপাদনে, পোকা-মাকড় দমনে, কৃষি পণ্য সংরক্ষণে, বাজারজাত করণে, উন্নত বীজ উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে প্রযুক্তি। আবহাওয়া, ঝড়-বৃষ্টি, বন্যা, খড়া প্রভৃতির খবরা-খবর কৃষক আগে-ভাগেই জানতে পারছে

মোবাইল ফোনে বা ইন্টারনেটে । সে অনুযায়ী সে প্রস্তুতি নিতে পারছে কৃষক ঘরে বসেই সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষি পণ্যের বাজারদর জানতে পারে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ।

চিকিৎসায় : কোনোকালেই মানুষের জীবন রোগ-শোক জরা-ব্যাধি মুক্ত ছিল না । রোগ-ব্যাধি থেকে নিরাময়ের প্রচেষ্টা মানুষের চিরকালের আকুতি । মানুষ একসময় রোগ-ব্যাধিতে দোয়া-তাবিজ, তন্ত্র-মন্ত্র, পানি-পড়া, ঝাড়-ফুক ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল ছিল । কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, যক্ষ্মা প্রতিনিয়তই কেড়ে নিত মানুষের অমূল্য জীবন । বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে এসব রোগকে মানুষ অনেকটাই জয় করতে পেরেছে । শিশু মৃত্যুর হার কমেছে । বসন্ত নির্মূল সম্ভব হয়েছে । অনেক জটিল অপারেসন সম্ভব হচ্ছে বিনা অস্ত্রোপচারে । মানুষের শরীরের অনেক অঙ্গ-প্রতঙ্গ সংযোজন এখন নিত্য-ব্যাপার । মানুষ বেরিয়ে এসেছে কুসংস্কার থেকে । ঘরে বসেই ইন্টারনেটে, ফোনে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন পাচ্ছেন ।

শিক্ষাক্ষেত্রে : কোনো বই পড়া কিংবা শিক্ষকের ক্লাস শোনার চেয়ে প্রজেক্টরের মাধ্যমে পর্দায় দেখানো গেলে তা হয় রসগ্রাহী । শিক্ষার্থীদের তা হৃদয়ঙ্গম করতেও সহজ হয় । উত্তরপত্র মূল্যায়ন ফলাফল তৈরিকরণে OMR ব্যবহৃত হচ্ছে । তার ফলে শিক্ষার্থীর রোল নম্বর গোপন থাকে । এজন্য স্বচ্ছতা নিশ্চিতসহ দ্রুত ফলাফল দেয়া সম্ভব হচ্ছে । একসময় পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবার পর প্রত্যন্ত এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের তা জানতে এক সপ্তাহ লেগে যেত । এখন ফলাফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোনে জানতে পারে । উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদন করা যায় ঘরে বসেই মোবাইল ফোনে মোবাইলে ফলাফল পাবার পর কেউ প্রয়োজন মনে করলে রিস্কুটিং-এর আবেদনও করতে পারে মোবাইলে । আগে এসব কাজ সশরীরে হাজির হয়ে করতে হত যা ছিল বিড়ম্বনার ব্যাপার । ইচ্ছে করলে কোনো ছাত্র-ছাত্রী পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে পৃথিবীর নামিদামী যেকোনো লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারে ইন্টারনেটে । প্রয়োজনে ডাউনলোড করে প্রিন্টও করতে পারে । মানুষের ঘরই হয়েছে লাইব্রেরি ।

ই-গভর্ন্যান্স : আইসিটি নির্ভর প্রশাসনিক ব্যবস্থা হলো ই-গভর্ন্যান্স । এর ফলে প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে । সব জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সহ অনেক দপ্তরেও সকল সেবা স্বল্প সময়ে ঝামেলাহীনভাবে পাওয়ার জন্য চালু হয়েছে ই-সেবা কেন্দ্র ।

বিনোদন : আগে বিনোদনের জন্য ঘরের বাহিরে যেতে হতো । সিনেমা দেখতে হলে সিনেমা হলে যেতে হতো, খেলা দেখতে হলে খেলার মাঠে, গান শুনতে হলে গানের জলসায় যেতে হতো । এখন এসব বিনোদনের জন্য মানুষকে আর ঘর হতে বের হতে হয় না । ঘরে বসেই অনায়াসে এসব বিনোদনের সুবিধা পেতে পারে ইন্টারনেটে ।

ব্যবসায় : একজন বিক্রেতা তার পণ্যের ছবি, ভিডিও, দ্রব্যের মূল্য দিয়ে ইন্টারনেটেই পণ্যের পসরা সাজিয়ে দোকান খুলতে পারেন । ক্রেতাও ইন্টারনেটে দিতে পারেন পণ্যের অর্ডার এবং বিভিন্ন ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধের সুযোগ রয়েছে । আমরা প্রায়ই দেখি বেশিরভাগ পণ্য-দ্রব্যের প্যাকেটে আয়ত-ক্ষেত্রকার জায়গার ওপর বেশ অনেকগুলি সরু মোটা ডোরাকাটা দাগ থাকে । এগুলোকে বলা হয় সংক্ষেপে U.P.C. (Universal Product Code) বা অনেকসময় একে বার কোডও বলা হয় । বড় বড় বিপণিতে সয়ংক্রিয় আর নির্ভুলভাবে সব কাজ করার জন্য এ কোড ব্যবহৃত হয় । এ ব্যবস্থায় বিক্রয় সামগ্রির দাম, উৎপাদন সংখ্যা, প্রস্তুত কর্তার নাম, এক্সপায়ার ডেট ইত্যাদি বিক্রয় সামগ্রির প্যাকেটের গায়ে সরু মোটা দাগের সংকেতের মাধ্যমে লিখা হয় ।

তথ্য প্রযুক্তি দ্বারা কিযে সম্ভব না তাই বলা দুষ্কর । ঘরে বসেই বিমান এবং ট্রেনের টিকেট বুকিং এবং

এদের সময়সূচি জানা যাচ্ছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। মোবাইল ফোন দ্বারা বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস বিল পরিশোধ করা যাচ্ছে কোনো বিড়ম্বনা ছাড়াই। মোবাইল ফোন ব্যাংকিং, অনলাইন ব্যাংকিং প্রভৃতি সুবিধা পাচ্ছে জনগণ অনায়াসে স্বল্প সময়ে, স্বল্প খরচে এবং হয়রানিমুক্ত হয়ে। নাগরিকরা পাচ্ছেন মেসিন রিডএবল পাসপোর্ট–যা প্রতারণা থেকে রক্ষা করছে। ইন্টারনেট দূরুত্বকে জয় করেছে। অফিসের কাজ বাড়িতে বসেই করতে পারছে। বাড়িতে বসেই বাজার সারতে পারছে অনায়াসে। দেশের জরুরি বার্তা পাওয়া যাচ্ছে মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে। কিছু কিছু পত্রিকা একযোগে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রিন্ট হয়ে বের হচ্ছে। ফলে সকালে চায়ের টেবিলে সবাই একই সাথে পত্রিকা হাতে পাচ্ছে। জমির রেকর্ডপত্র দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে অনলাইনে সংগ্রহ করা যাচ্ছে।

কুফল : সব জিনিসেরই সুফলের পাশাপাশি কুফলও থাকে। তথ্য প্রযুক্তিও এর ব্যতিক্রম নয়। অবাধ তথ্য প্রযুক্তির ফলে আমাদের গোপনীয়তা ও দেশিয় সংস্কৃতি নষ্ট হচ্ছে। বিজাতিয় সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতিকে গ্রাস করছে।

অন্তরায় : ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য আমাদের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন হলেও ডিজিটাল সেবা দেয়ারমত মনষ্ক হয়ে গড়ে উঠতে পারিনি। প্রতিটা সরকারি হাসপাতালে একটা মোবাইল ফোন নম্বর দেয়া আছে। এর মাধ্যমে নাগরিকদের চিকিৎসা পরামর্শ পাবার কথা। দুঃখের বিষয় নাগরিকদের এই মোবাইল নম্বর জানানো হয় না বা অধিকাংশ নাগরিক এ সেবার খবরও জানে না। অনেক অফিসের কাজ অনলাইনের মাধ্যমে উর্ধ্বতন দপ্তরে পাঠানো হয়। এরপরও ঐ ফাইলের পিছনে ছুটতে হয় স্পিড মানি দেয়ার জন্য।

কোনো সেবা পাবার জন্য আমাদের মতো সাধারণ মানুষ কী জেলা প্রশাসক কিংবা পুলিশ সুপার বা ইউএনও মহোদয়ের অফিসে একসেস আছে ? গ্রামের কৃষকটি কী কৃষি অফিসার বা কৃষি ব্যাংকের ম্যানেজারের কক্ষে প্রবেশ করে অনায়াসে সেবা পাচ্ছেন ? গ্রামের কৃষকটি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তার ফসলের বালাই সম্পর্কে কৃষি অফিসার বা উপ-সহকারী কৃষি অফিসারের পরামর্শ পাচ্ছেন ? কোনো কৃষক তার হাঁস-মুরগি বা গরু-ছাগলের বালাই সম্পর্কে উপজেলা লাইবস্টক অফিসার বা ভ্যাটেরিনারি সার্জনের পরামর্শ কী পাচ্ছেন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ?

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বাইরে থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়। সরকার এজন্যই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়কে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত আবশ্যিক করেছে। দুঃখের বিষয় এ পর্যন্ত এ বিষয়ের শিক্ষকের পদই সৃষ্টি হয়নি। জোড়াতালি দিয়ে তাত্ত্বিক ক্লাস কোনোরকমে চললেও আব্যশিক এ বিষয় এত ছাত্র-ছাত্রীর ল্যাব সুবিধা না থাকায় ব্যবহারিক ক্লাস কোথাও হয় না বললেই চলে।

সরকারের ভিশন টুয়ান্টি-টুয়ান্টি ওয়ান অর্থাৎ ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নিত করতে হলে সবধরনের সেবা নিশ্চিত করতে হবে। ইন্টারনেটের স্পিড বাড়াতে হবে। নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। সুশাসন, বিশুদ্ধ গণতন্ত্র–সমাজে, দলের ভেতরে এবং রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিজ্ঞানমনষ্ক দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হবে। তাহলেই আমরা প্রকৃত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারব।

লেখক পরিচিতি : বিভাগীয় প্রধান, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, কালিহাতী কলেজ, টাঙ্গাইল

হাতের কাছেই রোগমুক্তির উপশমক

– হোসনে আরা পারভীন

পৃথিবীতে মানুষের আগমনের শুরু থেকেই মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। এ সব প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করতে মানুষ যার সহায়তা সবচেয়ে বেশি পেয়েছে এবং যা অত্যন্ত সহজলভ্য হিসেবে ব্যবহার করেছে তা হলো উদ্ভিদ। উদ্ভিদকে মানুষ ব্যবহার করেছে খাদ্যের উৎস, আশ্রয়স্থল, আবাস নির্মাণের উপরকরণ, পরিধেয় আবরণ, অলংকার, জ্বালানি ইত্যাদিসহ রোগ যন্ত্রণা, ব্যথা-বেদনা ও রক্তক্ষরণ-ক্ষত নিরাময়ের ওষুধ হিসেবে।

পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম (আ:) এবং মা হাওয়া (আ:) বেহেশতের মধ্যে 'উদ' গাছের পাতা ব্যবহার করে বনজ সম্পদ ব্যবহারের শুভ সূচনা করেন। তিনিই আবার পৃথিবীতে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ফল খেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন এবং উদ্ভিজ্জ চিকিৎসা ব্যবস্থার সূচনা করেন।

উদ্ভিদের ঔষধি গুণাবলী সম্পর্কে কোন পূর্ব ধারণা না থাকলেও সহজাত প্রজ্ঞা ও প্রবৃত্তির বশে আদিম মানুষ শুরু থেকেই উদ্ভিদকে ওষুধ বা শারীরিক যন্ত্রণার উপশমক হিসেবে ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। চেখে চেখে ভুল-ভ্রান্তির মাধ্যমেও অনেক উপকারী এবং অপকারী উদ্ভিদ মানুষ বাছাই করে নিয়েছে। তাছাড়া, স্রষ্টা বিশেষ চিহ্ন বা আকৃতি দিয়ে কোনো কোনো উদ্ভিদের অঙ্গকে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহারের ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। যেমন–হৃৎপিণ্ডাকার পাতা বা ফল হৃদরোগের চিকিৎসায়, বৃক্কাকার ফল বা পাতা বৃক্কের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায়, রক্তবর্ণের তরুক্ষীর বিশিষ্ট উদ্ভিদকে রক্তবর্ধক হিসেবে প্রদান করেছেন। নিজের অস্তিত্বকে সুসংহত করে পৃথিবীতে টিকে থাকার স্বার্থেই মানুষ আহরিত এই জ্ঞান প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে হস্তান্তর করেছে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে। ফলে কষ্টলব্ধ এই জ্ঞান কখনও কালের গহ্বরে হারিয়ে না গিয়ে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

খ্রীস্টের জন্মেরও বহু পূর্বে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক মহর্ষি চরক বলেছিলেন, "যার জন্ম যেখানে তার ভেষজও সেখানে জন্মগ্রহণ করে থাকে"। তাই নিজ দেশে উৎপন্ন ভেষজ আজও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। জীবদেহের নানা ক্রিয়াকলাপ বিভিন্ন প্রকারের জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। কোন কারণে এসব রাসায়নিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হলে জীবদেহের জৈবিক প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে এবং অসুস্থ হয়ে পরে জীবদেহ। এই অসুস্থ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে নানা রাসায়নিক যৌগের ব্যবহার হয় এবং এটিই বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি।

এসব রাসায়নিক যৌগের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকে কিন্তু ভেষজ উদ্ভিদের তেমন কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই বরং অনেকগুলোই খুব সহজে বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যায়।

যে সমস্ত উদ্ভিদে মানুষের রোগবালাই সারিয়ে তোলার ক্ষমতা রয়েছে তাকে রোগমুক্তির উপশমক 'ভেষজ উদ্ভিদ' বলে। এর গুনাগুন নির্ভর করে সেই উদ্ভিদস্থ অ্যালকোলয়েড বা উপক্ষারের উপর। অ্যালকোলয়েড হল ভেষজ উদ্ভিদের নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব রাসায়নিক পদার্থ যা মানুষের রোগ দমন করে। সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের এ দেশ। এ দেশের বনাঞ্চল, বসত বাড়ির আশেপাশে ও ভিটে বাড়িতে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য প্রজাতির ভেষজ উদ্ভিদ। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে অনিয়ন্ত্রিত বনজ সম্পদ আহরণ, নতুন বসত বাড়ি তৈরী, রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি প্রয়োজনে অনেক মূল্যবান ভেষজ উদ্ভিদের প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এ সকল ভেষজ উদ্ভিদ সংরক্ষণের জন্য প্রজাতিসমূহকে সঠিকভাবে

চিহ্নিত ও লালন করা বিশেষ দরকার এবং এদের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত করতে জানা প্রয়োজন কোন উদ্ভিদ কি রোগে ব্যবহৃত হয়। আবার একই উদ্ভিদের নাম অঞ্চলভেদে বিভিন্ন হয়। সে কারণে একই প্রজাতির বিভিন্ন নামের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য এদের উদ্ভিদ তাত্ত্বিক বা বৈজ্ঞানিক নাম জানা বিশেষ প্রয়োজন।

এ দিকে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও ব্যয় বাহুল্যের কারণে সভ্যতার চরমশিখরে আরোহন করেও পাশ্চাত্য দেশসমূহে ভেষজ চিকিৎসার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারও এ বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা খুবই যুগোপযোগী ও প্রশংসনীয়।

বিভিন্ন লেখক এবং চিকিৎসক বিভিন্ন বইয়ে ভেষজ উদ্ভিদ সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছেন। আমি জীববিজ্ঞানের শিক্ষক, এইচ এস সি-এর উদ্ভিদ বিজ্ঞান বই-এর ভেষজ উদ্ভিদ অংশটুকু নিয়ে আমার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল, আর সেই আগ্রহ থেকে এ বিষয়ের বিভিন্ন বই পড়া এবং সেখান থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কিছু উদ্ভিদ নিজের অসুস্থতায় প্রয়োগ করেছি এবং এর ফলাফলসহ উদ্ভিদগুলোর ছবি সম্বলিত বর্ণনা সকলের নিকট পরিচিত করার জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

কালোমেঘ :

- আঞ্চলিক নাম : চিরতা তিক্ত, যবতিক্তা, সহাতিক্তা, শ্বেত তিক্তা, তিক্তফলা, কালোমেঘ।
- বৈজ্ঞানিক নাম : Andrographis Paniculata।
- আবাস : বাংলাদেশের সর্বত্র এবং ভারতের অনেক স্থানে কালোমেঘ জন্মাতে দেখা যায়। হালকা ছায়াবিশিষ্ট রসযুক্ত মাটিতে এটি ভাল জন্মে।
- দৈহিক গঠন : কালোমেঘ একটি বর্ষজীবি উদ্ভিদ, আধা মিটার থেকে এক মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা চারকোণাকৃতি, নরম ও সবুজ। পাতার অগ্রভাগ এবং বোঁটার দিক ক্রমশ: সরু, গাঢ় সবুজ রংয়ের পরস্পর বিপরীতমুখী জোড়া জোড়া পাতা দেখতে মরিচের পাতার মত। পাতা এবং কাণ্ডের সংযোগস্থল থেকে সাদা ছোট ছোট ফুল হয়, ফুল লালও হয় তবে লোমযুক্ত। ফল রৈখিক আয়তাকৃতি উভয়প্রান্ত সূক্ষ্ম, দেখতে যবের মত এবং তিক্ত স্বাদের বলে এর নাম যবতিক্তা। সমগ্র গাছই ওষুধে ব্যবহৃত হয় বলে গাছের নামেই ওষুধ 'কালোমেঘ'। অবশ্য কেউ কেউ এ ওষুধকে সবুজ চিরতাও বলে।

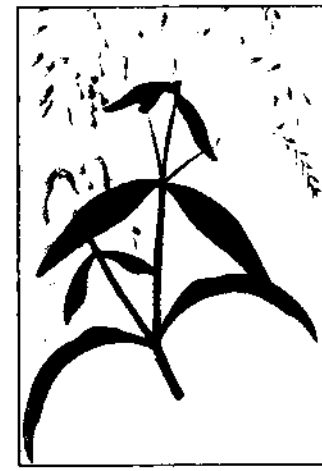

Andrographis Paniculata
(কালোমেঘ)

- ঔষুধিগুণ : কালোমেঘের প্রধান ব্যবহার পেটের বিভিন্ন পীড়া, যেমন–উদারাময়, অম্ল, অজীর্ণ, রক্ত আমাশয় ইত্যাদিতে।
  ১। জ্বর হলে কালোমেঘের পাতার রস ১৫/২০ ফোঁটা পানিতে মিশিয়ে দিনে ২/৩ বার পান করলে উপকার পাওয়া যায়।
  ২। বাচ্চাদের পেট কামড়ানি, উদারাময়, ক্ষুধামান্দ্য, কিমিজর্নিত পেট ব্যথায় কালোমেঘ পাতার রস দারুচিনি, লবঙ্গ, গোল মরিচ অথবা সমপরিমাণ জিরা, রাঁধুনি, মৌরি, জায়ফল এবং বড় এলাচের খোসা নিয়ে খুব মিহি করে পিষে তা দিয়ে ছোট ছোট বড়ি তৈরি করে শুকিয়ে নিয়ে প্রতিদিন একটি করে সেবন করলে রোগ নিরাময় হয়।
  ৩। কালোমেঘের পাতার রস অর্ধ থেকে এক চা-চামচ এবং বড় এলাচের বীজ চূর্ণ ৬০-১২০ মিলিগ্রাম

মিশিয়ে সকাল বিকাল খেলে অম্ল ও অজীর্ণ রোগ আরোগ্য হয়।

৪। কৃমি হলে ৩০/৩৫ ফোঁটা পাতার রস সমপরিমাণ কাঁচা হলুদের রস একত্রে সকাল-বিকাল তিনদিন পান করতে হবে।

৫। যেকোন পঁচা ঘায়ে কালোমেঘের পাতা সেদ্ধ করে ছেকে সেই পানি দিয়ে ৩/৪ দিন প্রতিদিন ২ বার ক্ষত স্থান ধুয়ে দিলে ৩/৪ দিনের মধ্যে সেরে যায়।

৭০/৮০ এর দশকে এখনকার মত কৃমির তত ভাল ওষুধ ছিল না। যেগুলো ছিল তা খেলে জোলাপ ধরতো অর্থাৎ সারাদিন পাতলা পায়খানা হত, সাথে কৃমি বের হয়ে যেত। তাই অনেকেই ঐ ওষুধগুলো খেতে ভয় পেতো। ছোট বেলায় আম্মাকে দেখেছি প্রতিরাতে চিরতা পানিতে ভিজিয়ে রাখতো এবং সকাল বেলা খালি পেটে আমাদের খাওয়াতো আর সেই কারণেই হয়ত ঐসব ক্রিমির ওষুধ আমাদের খেতে হয়নি।

- Chemical Composition : কালোমেঘের মধ্যে রয়েছে–(a) Alkaloids (Kalameghin) (b) Andrographolide (c) Strols.

নিশিন্দা :

- আঞ্চলিক নাম : সিন্দুবার, নির্গুণ্ডী।
- বৈজ্ঞানিক নাম : Vitex Negundo।
- আবাস : বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র এই গাছের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তবে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বেশী দেখা যায়।
- দৈহিক গঠন : নিশিন্দা বড় আকারের গুল্ম। ৩–৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। ঘন শাখা-প্রশাখা থাকে। ২–৫ সে.মি. পর্যন্ত লম্বা বৃন্তবিশিষ্ট যৌগিক পত্রের ৩/৫ টি পত্রক থাকে। পত্রকগুলো অসমান ও বর্শাকৃতির। একটু ঘষলে তীব্র গন্ধ পাওয়া যায়। উপরের পৃষ্ঠ সবুজ এবং নিচের পৃষ্ঠ সাদা। ফুল নীলাভ ও বেগুনী রঙের। ফল ছোট ও ডিম্বাকৃতির।

Vitex Negundo (নিশিন্দা)

- Chemical Composition : (a) Alkaloids Viz. Nishindine, etc. (b) Essential Oil (c) Sterols (d) Terpenoid Constituents.

ঔষুধি গুণ :

১। নিশিন্দার পাতা পরজীবিনাশক এবং এর যক্ষা ও ক্যান্সার বিরোধী গুণ রয়েছে।

২। বৃদ্ধ বয়সে রাতে প্রস্রাবের পরিমাণ বেশী হয় অথবা ৬/৭ বছরের বাচ্চারাও অনেকে রাতে বিছানায় প্রস্রাব করে। এ ক্ষেত্রে ২/৩ রতি পরিমাণ নিশিন্দা পাতা চূর্ণ পানিসহ বিকালে খেলে ৪/৫ দিনের মধ্যে উপকার পাওয়া যায় এবং এর ব্যবহারে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।

৩। নিশিন্দা পাতার রস দিয়ে জ্বাল দেয়া ঘি দিনে ও রাতে গদুইবার মুখ বা জিহ্বার ঘায়ে লাগালে সুফল পাওয়া যায়।

৪। এই পাতার রস তেলে জ্বাল দিয়ে ব্যবহার করলে টাক পড়া বন্ধ, খুস্‌কি দূর এবং চুলকানিতে উপকার পাওয়া যায়।

মিশিয়ে সকাল বিকাল খেলে অম্ল ও অজীর্ণ রোগ আরোগ্য হয়।

৪। কৃমি হলে ৩০/৩৫ ফোঁটা পাতার রস সমপরিমাণ কাঁচা হলুদের রস একত্রে সকাল-বিকাল তিনদিন পান করতে হবে।

৫। যেকোন পঁচা ঘায়ে কালোমেঘের পাতা সেদ্ধ করে ছেকে সেই পানি দিয়ে ৩/৪ দিন প্রতিদিন ২ বার ক্ষত স্থান ধুয়ে দিলে ৩/৪ দিনের মধ্যে সেরে যায়।

৭০/৮০ এর দশকে এখনকার মত কৃমির তত ভাল ওষুধ ছিল না। যেগুলো ছিল তা খেলে জোলাপ ধরতো অর্থাৎ সারাদিন পাতলা পায়খানা হত, সাথে কৃমি বের হয়ে যেত। তাই অনেকেই ঐ ওষুধগুলো খেতে ভয় পেতো। ছোট বেলায় আম্মাকে দেখেছি প্রতিরাতে চিরতা পানিতে ভিজিয়ে রাখতো এবং সকাল বেলা খালি পেটে আমাদের খাওয়াতো আর সেই কারণেই হয়ত ঐসব ক্রিমির ওষুধ আমাদের খেতে হয়নি।

- Chemical Composition : কালোমেঘের মধ্যে রয়েছে–(a) Alkaloids (Kalameghin) (b) Andrographolide (c) Strols.

নিশিন্দা :

- আঞ্চলিক নাম : সিন্দুবার, নির্গুণ্ডী।
- বৈজ্ঞানিক নাম : Vitex Negundo।
- আবাস : বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র এই গাছের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তবে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বেশী দেখা যায়।
- দৈহিক গঠন : নিশিন্দা বড় আকারের গুল্ম। ৩–৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। ঘন শাখা-প্রশাখা থাকে। ২–৫ সে.মি. পর্যন্ত লম্বা বৃন্তবিশিষ্ট যৌগিক পত্রের ৩/৫ টি পত্রক থাকে। পত্রকগুলো অসমান ও বর্শাকৃতির। একটু ঘষলে তীব্র গন্ধ পাওয়া যায়। উপরের পৃষ্ঠ সবুজ এবং নিচের পৃষ্ঠ সাদা। ফুল নীলাভ ও বেগুনী রঙের। ফল ছোট ও ডিম্বাকৃতির।

Vitex Negundo (নিশিন্দা)

- Chemical Composition : (a) Alkaloids Viz. Nishindine, etc. (b) Essential Oil (c) Sterols (d) Terpenoid Constituents.

ঔষুধি গুণ :

১। নিশিন্দার পাতা পরজীবিনাশক এবং এর যক্ষা ও ক্যান্সার বিরোধী গুণ রয়েছে।

২। বৃদ্ধ বয়সে রাতে প্রস্রাবের পরিমাণ বেশী হয় অথবা ৬/৭ বছরের বাচ্চারাও অনেকে রাতে বিছানায় প্রস্রাব করে। এ ক্ষেত্রে ২/৩ রতি পরিমাণ নিশিন্দা পাতা চূর্ণ পানিসহ বিকালে খেলে ৪/৫ দিনের মধ্যে উপকার পাওয়া যায় এবং এর ব্যবহারে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।

৩। নিশিন্দা পাতার রস দিয়ে জ্বাল দেয়া ঘি দিনে ও রাতে গদুইবার মুখ বা জিহ্বার ঘায়ে লাগালে সুফল পাওয়া যায়।

৪। এই পাতার রস তেলে জ্বাল দিয়ে ব্যবহার করলে টাক পড়া বন্ধ, খুস্কি দূর এবং চুলকানিতে উপকার পাওয়া যায়।

৫। নিশিন্দা পাতার তীব্র গন্ধের কারণে জামা-কাপড়, ফসল, বই পোকার উপদ্রব থেকে রক্ষা পায়। তাই আমি চাউলের ড্রাম, বই-এর আলমারিতে নিশিন্দার শুকনো পাতা ব্যবহার করি।

৬। ধূপের সাথে শুকনো পাতা ব্যবহার করলে মশা দূর হয়।

কালোজিরা :

- আঞ্চলিক নাম : কালিজিরা।
- বৈজ্ঞানিক নাম : Nigella Sativa।
- আবাস : কালোজিরার আদি আবাস দক্ষিণ ইউরোপ হলেও বর্তমানে সারা ভারত ও বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে এর চাষ হয়
- পরিচিতি : কালোজিরা ছোট ও নরম বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। পাতার রং সবুজ, আকার ও আকৃতি অনেকটা ধনে পাতার মত পত্রদণ্ডের উভয়দিকে জোড়া পাতা বের হয় পত্রদণ্ডের আগা থেকে সাদা, নীল ও হালকা পীত বর্ণের ফুল বের হয়। ফল গোলাকার, ফলের ৫-৬ টি লম্বালম্বি খাঁজ থাকে। এটি বীজ প্রকোষ্ঠের দাগ প্রকোষ্ঠগুলোতে অনেকগুলো তিন কোনাকার বীজ থাকে।
- Chemical Composition : (a) Volatile Oil (b) Glycerides (c) Saponin (d) Protein (e) Tannin (f) Reducing Sugar (g) Resin ইত্যাদি।

ঔষুধি গুণ :

১। সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত আছে-হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এরশাদ করেন, "তোমরা কালোজিরা ব্যবহার করবে। কেননা এতে একমাত্র মৃত্যুরোগ ছাড়া সর্বরোগের আরোগ্য রয়েছে"।

২। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করিম (সঃ) ইরশাদ করেন, "যখন রোগযন্ত্রণা খুব বেশী কষ্টদায়ক হয়, তখন এক চিমটি পরিমাণ কালোজিরা নিয়ে খাবে, অতঃপর পানি-ওষুধ সেবন করবে" *(মুজামুল আওসাত: তাবরানী)*

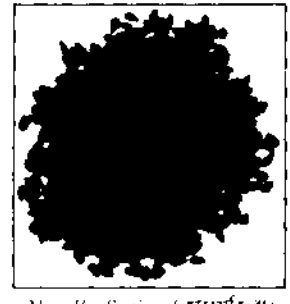
Nigella Sativa (কালোজিরা)

অভিজ্ঞ ইউনানী চিকিৎসকগণ নবীয়ে উম্মী (সাঃ) এর পবিত্র বাণীর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েন যে, "কালোজিরা ঠাণ্ডা জাতীয় ব্যাধি, সর্দি, কফ, কাশি ইত্যাদির জন্য অত্যন্ত উপকারী। পক্ষাঘাত (প্যারালাইসিস) ও কম্পন রোগে (পার্কিনসন) কালোজিরার তেল মালিশ করলে আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া যায় কালোজিরা যৌন ব্যাধি ও স্নায়ুবিক দূর্বলতায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য অতি উৎকৃষ্ট ওষুধ। পাকস্থলীতে বায়ু সঞ্চয়, শূলবেদনা, প্রসূতি রোগে, ব্রণের জন্য, পুরাতন জ্বর, মূত্র থলির পাথর, পাণ্ডুরোগ (জণ্ডিস), কৃমির জন্য অত্যধিক উপকারী"। *তথাসূত্র- কিতাবুল সুফরাদাত : খাওয়াসসুল আদাবিয়া পৃ: ২৭৯)*।

৩। কালোজিরায় Volotile Oil থাকায় এটি কাশি, সর্দি, হাঁচির জন্য খুবই ফলপ্রসু। শ্লেষ্মা বসে যেয়ে মাথা ব্যথা হলে কালোজিরা বেটে কপালে প্রলেপ দিলে এবং একই সাথে এর ঝাঁজ নাকে টানলে সর্দি তরল হয়ে বের হয়ে আসবে ও মাথার যন্ত্রণার উপশম হবে

৪। অনেকের অ্যালার্জিজনিত কারণে খুব হাঁচি হয়, এ ক্ষেত্রে অ্যালোপ্যাথি ওষুধে উপকার পাওয়া গেলেও শরীর ঝিমঝিম ও তন্দ্রায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। সকাল বিকাল অর্ধেক চা চামচ কলোজিরা সেবন করলে কোনরকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই উপকার পাওয়া যায়।

৫। কালোজিরা পরিপাক তন্ত্রের কার্যক্ষমতা বাড়ানো, পাকস্থলির ব্যথা ও গ্যাস নিরাময়ে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

৬। মাতৃদুগ্ধ কমে গেলে অর্ধেক চা চামচ কালোজিরা গুড়া ৭/৮ চামচ দুধে মিশিয়ে সকাল বিকাল সপ্তাহ খানেক খেলে দুধ বেড়ে যায়। গ্রাম-গঞ্জে সদ্য প্রসূতিকে কালোজিরার ভর্তা খাওয়ানো হয়। আমি খেয়েছি। এটা সত্যি কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

৭। কালোজিরায় জীবাণুনাশক উপাদান থাকায় সরষের তেলে ভেজে ঐ তেল গায়ে মাখলে চুলকানি থাকে না।

৮। অনিয়মিত ও অল্প ঋতুস্রাবে ৫০০ মি.গ্রাম বা চা চামচের অর্ধেকের কম কালোজিরা বেটে হালকা গরম পানিসহ মাসিকের ৫/৭ দিন আগে থেকে সকাল বিকাল দু'বার খেতে হবে।

অতিরিক্ত পরিমাণ কালোজিরা গর্ভবতী মায়ের গর্ভস্রাব ঘটাতে পারে, তাই গর্ভাবস্থায় না খাওয়াই ভাল।

ছাতিম :

- আঞ্চলিক নাম : ছাতিয়ান, সপ্তপর্ণী, সুপর্ণক, সপ্তচ্ছদ, সদগন্ধ, সপ্তপর্ণ, ছাইতান ইত্যাদি।
- বৈজ্ঞানিক নাম : Alstonia Scholaris।
- আবাস : বাংলাদেশ, ভারত, চীনসহ এশিয়ার প্রায় সর্বত্রই এই গাছ পাওয়া যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় এক হাজার মিটার উঁচুতেও এটি জন্মায়। তবে সমভূমিতে এ গাছ দ্রুত বাড়ে।
- দৈহিক গঠন : ছাতিম গাছের আকৃতির মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য গাছে অনুপস্থিত। বড় ধরনের চির সবুজ, ঘন পাতাযুক্ত বৃক্ষ যা ১৫–২০ মিটার লম্বা হয়। কাণ্ডের চারিদিকে শাখা এবং শাখার চারিদিকে ৪–৭ টি পাতা ছাতার মত ছড়ানো থাকে। সম্ভবত এজন্য এর নাম ছাতিম। আবার প্রায় সব শাখারই অগ্রভাগে ছত্রাকারে ৭ টি পাতা সাজানো থাকে। তাই এর অন্য নাম সপ্তপর্ণা বা সপ্তপর্ণী। পাতাগুলো ছোট বৃন্তবিশিষ্ট দীর্ঘ বর্শাফলাকৃতি কিংবা দীর্ঘ ডিম্বাকৃতি। পাতার উপরের দিক গাঢ় সবুজ, নিচের দিক হালকা সবুজ এবং খয়েরী পশমের মত রোমাবৃত। গাছের সকল অংশ থেকে সাদা দুধের মত, তিক্ত স্বাদের কষ বের হয়। শরৎ থেকে হেমন্তে ফুল হয়। ফুল অনুজ্জ্বল ছোট, সবুজ-সাদা অনাকর্ষী। কিন্তু এর ছত্রাকৃতি মঞ্জুরির প্রাচুর্যে পুষ্পিত ছাতিম খুব সুশ্রী। গন্ধ অতি উগ্র, যাতে নেশার ঝাঁছ রয়েছে। এই কারণে এর এক নাম 'সদগন্ধ।

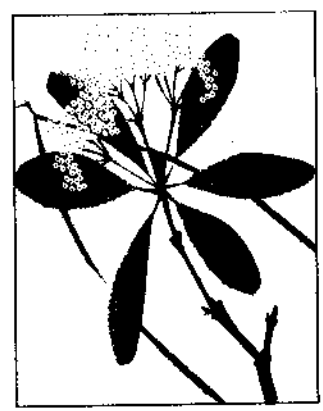

Alstonia Scholaris (ছাতিম)

- Chemical Composition : (a) Alkloids, Viz. Echitamine, Echitamidine, Echiteninederivative (b) Lactones (c) Sterols.

ঔষুধি গুণ :

১। ছাতিম ছালের প্রধান ও প্রচলিত ব্যবহার কুষ্ঠরোগে। চিকিৎসা শাস্ত্র চরক সংহিতায় পাওয়া যায়–কোন জায়গায় সাদা বা লাল দাগ দেখা গেলে জায়গাটা একটু উঁচু ও বোধহীন হলে বোঝা যায় এটি কুষ্ঠের লক্ষণ। এ ক্ষেত্রে ছাতিম ছাল চূর্ণ এক গ্রাম, এক চা চামচ গুলঞ্চের রস মিশিয়ে খেতে হবে। ১০/১২ গ্রাম ছাল তিন কাপ জলে সেদ্ধ করে এক কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে ঐ

পানি দিয়ে আক্রান্ত স্থান ধুয়ে দিতে হবে।

২। কফের আধিক্যসহ হিক্কা শ্বাসে ছাতিম ছালের আধা চবা চামচ রস চার ভাগের এক ভাগ দুধের সাথে মিশিয়ে খেলে উপশম হয়।

৩। সর্দিবিহীন হাঁপানিতে এক গ্রাম ছাতিম, চালের গুড়া, ২৫০ মি.গ্রাম পিপুল চূর্ণ, দই এর সাথে মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়।

৪। ঠাণ্ডা প্লেগে বুকে সর্দি বা শ্লেষ্মা বসে গেলে পানি মিশানো দুধে ১ গ্রাম ছাতিম ছাল গুড়া দিয়ে অল্পক্ষণ ফুটিয়ে সেটা খেলে সর্দি তরল হয়ে উঠে আসবে।

৫। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থ ভাগবতে পাওয়া যায়-ডাক্তার বোরিক তাঁর সেটোরিয়া মেডিকা গ্রন্থে 'এলস্টোনিয়া স্কলারিসা' নামক ওষুধ (ছাতিমের বৈজ্ঞানিক নামেই ওষুধের নাম) প্রসঙ্গে লিখেছেন, উদারাময়, আমাশয়, রক্তশূন্যতা, ক্ষীণ পরিপাক শক্তির সঙ্গে ম্যালেরিয়া থাকলে এ ওষুধ নির্দেশিত।

৬। ছাতিমের আঠা দাঁতের যন্ত্রণা আক্রান্ত স্থানে প্রয়োগ করলে বা পাইয়োরিয়া হলে গরম পানিতে এই আঠা দিয়ে গারগাল করলে উপশম হয়।

৭। চুলের যত্নে আমলকির সাথে ছাতিমের শুকনো ফুল বেটে মাথায় লাগানো হয়।

বাংলা সাহিত্যে ছাতিম নামটি বিশেষ পরিচিত। বিশ্ব বরেণ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শান্তি নিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর প্রমাণপত্রের প্রতীকস্বরূপ এই 'সপ্তপর্ণী' এর পত্র দেয়া হয়।

কুরচি :

- আঞ্চলিক নাম : কুরচি, ইন্দ্রযব।
- বৈজ্ঞানিক নাম : Holarrhena Antidysenterica।
- আবাস : বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এই উদ্ভিদ আপনা-আপনি জন্মে থাকে। বাংলাদেশ, ভারত ও মাদাগাস্কার এর আদি নিবাস।
- দৈহিক গঠন : মাঝারি ধরনের পত্রঝরা এ গাছটি ৮/৯ মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। ছোট ছোট ডিম্বাকার পাতা ১৫-২০ সে.মি. লম্বা ও ৩-৬ সে.মি. প্রস্থ হয়। এপ্রিল মাসে অল্প গন্ধযুক্ত সাদা ফুল ফোটে। বরবটির মতো ২০-২৫ সে.মি. লম্বা ফল বের হয়।

Holarrhena Antidysenterica
(কুরচি)

- Chemical Composition : (a) Holadysamine, Holarrhidine Kurchine, Sterols, Impeol, Flavonoids, Resin, Tannin.
- ঔষুধি গুণ : আমাশয়ে কুরচি ভাল কাজ করে বলেই এর নাম Antidysenterica.

১। কুরচি পাতা ও বীজে Flavonid রয়েছে যা কৃমি দমনে সাহায্য করে। ১ গ্রাম কুরচি বীজ চূর্ণের সাথে মধু মিশিয়ে চেটে খেলে এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

২। কুরচির ছালে Tannin রয়েছে। এ Tannin ক্ষত কোষের সংস্পর্শে এসে কোষের আমিষের সাথে বিক্রিয়া করে একটি পাতলা আবরণের সৃষ্টি করে ক্ষতস্থান সারিয়ে তোলে। তাই

মুখে ক্ষত হলে ১০ গ্রাম কুরচির ছাল ৩ কাপ পানিতে সেদ্ধ করে ১ কাপ থাকতে ছেঁকে মুখে নিয়ে ৫/৭ মিনিট রাখলে ক্ষত ভাল হয়ে যায়।

৩। এর কাণ্ড ও বাকল থেকে উদারাময়, পযুরাতন আমাশয় ও কৃমিনাশক ওষুধ তৈরী করা হয়।

সহায়ক গ্রন্থ :

- *উচ্চ মাধ্যমিক জীব বিজ্ঞান, প্রথম পত্র : উদ্ভিদ বিজ্ঞান। লেখক : এনায়েত হোসেন, গাজী আজমল, সাফিউর রহমান ও তরিকুল ইসলাম।*
- *ভেষজ উদ্ভিদ ও লোকজ ব্যবহার (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)। লেখক : অবনী ভূষণ ঠাকুর।*
- *ওষুধি উদ্ভিদ পরিচিতি, উপযোগিতা ও ব্যবহার। লেখক : ড. সামসুদ্দিন আহমদ।*

দেশজ ভেষজ ও তার প্রয়োগ। লেখক : মোহাম্মদ বাবুল আক্তার।

লেখক পরিচিতি : প্রভাষক, জীব বিজ্ঞান, সুমন মঞ্জিল, হোল্ডিং নং-৬৩৩, রানী নগর, সাধুর মোড়, ঘোড়ামারা, রাজশাহী

বাংলাদেশে আমের চাষাবাদ, বিভিন্ন জাত ও বাহারী নামকরণ

- কৃষিবিদ ড. মোঃ শরফ উদ্দিন

পৃথিবীতে আমের ইতিহাস অনেক পুরাতন ও সমৃদ্ধ : আমকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, রচিত হয়েছে গল্প, কবিতা ! এ ছাড়াও আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে আম স্থান করে নিয়েছে . বাংলাদেশের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থাও আমের উপর নির্ভরশীল ! আমের মৌসুমে আম উৎপাদন এলাকার ৯০–৯৫ ভাগ মানুষ আমের উৎপাদন, সংগ্রহ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানীর সাথে জড়িত থাকে । আমের উৎপত্তি স্থান হিসেবে বাংলাদেশের দক্ষিণাংশের চট্টগ্রামের পাহাড়িয়া অঞ্চলকে ধরা হয় ; তবে, বর্তমানে সকল জেলাতেই আম গাছ জন্মাতে ও ফল দিতে দেখা যাচ্ছে ! দেশের উত্তর ও পশ্চিমের জেলাসমূহে আমের বাণিজ্যিক চাষাবাদ হচ্ছে । কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে বর্তমানে দেশের প্রায় ৭০ হাজার হেক্টর জমিতে আমের চাষাবাদ হচ্ছে যার উৎপাদন প্রায় ৯.৫ লাখ টন । এই পর্যন্ত বাংলাদেশে কত প্রজাতির আম রয়েছে তার সঠিক হিসাব নেই । তবে, বিজ্ঞানীদের ধারণা বিভিন্ন আম বিষয়ক পুস্তক ও গবেষণার অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় এ দেশে আমের প্রায় ৮০০ টি জার্মপ্লাজম রয়েছে দু'টি প্রতিষ্ঠান হতে এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয়েছে ৩১ টি আমের জাত । নামকরণ হয়েছে ভিন্নভাবে । বাগান মালিক নিজেই নিজ নামসহ স্ত্রী, পুত্র কন্যা এমনকি গোলামের নামের আমের নামকরণ করেছেন । আমের নামকরণ সত্যই বিচিত্র রকমের । বিভিন্ন দেশে আমকে ডাকা হয় বিভিন্ন নামে , যেমন–আম, ম্যাংগো, আম্বা, মাংগুয়ো, মা মুয়াং ইত্যাদি । পৃথিবীর অনেক দেশ আবার পরিচিত নিজ দেশে উৎপাদিত আম রপ্তানি করে । যেমন–ভারত : আলফনসো ও চৌসা, পাকিস্তান : সিন্দরী, ফিলিপাইন : ক্যারাবাউ এবং থাইল্যান্ড : নমডকমাই জাতের আমের মাধ্যমে পরিচিতি পেয়েছে । এখন আমরা পরিচিত হবো আমের বিভিন্ন জাতের নামকরণের সাথে ।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এই পর্যন্ত ১০ টি আমের জাত মুক্তায়ন করেছে । মুক্তায়িত আমের জাতগুলো হল : বারি আম-১, বারি আম-২, বারি আম-৩, বারি আম-৪ (হাইব্রিড), বারি আম-৫, বারি আম-৬ (বৌভুলানি), বারি আম-৭ (আপেল আম), বারি আম-৮ (রাঙ্গুয়াই), বারি আম-৯ (কাঁচামিঠা) এবং বারি আম-১০ (কালিয়া) ।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহের বাউ জার্মপ্লাজম সেন্টার হতে মুক্তায়িত হয়েছে আমের ২১টি জাত : এই জাতগুলোর নামকরণ আবার ভিন্ন ধরনের । যেমন–এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-১ (শ্রাবনী), এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-২ (সিন্দরী), এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-৩ (ডায়াবেটিক), এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-৪ (রাডি), এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-৫ (শ্রাবনী-২), এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-৬ (পলিএমব্রায়োনি-১), এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-৭ (পলিএমব্রায়োনি-২), এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-৮ (পলিএমব্রায়োনি-রাঙ্গুয়াই-৩), এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-৯, এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-১০, এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-১১, এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-১২, এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-১৩, এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-১৪, এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-১৫, এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-১৬, এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-১৭, এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-১৮, এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-১৯, এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-২০ এবং এফটিআইপি বাউ ম্যাংগো-২১ : এ ছাড়াও রয়েছে অসংখ্য নাম জানা

ও অজানা গুটি জাতের আম।

দেশীয় আম : ল্যাংড়া, খিরসাপাত, গোপালভোগ, ফজলি, আশ্বিনা, বোম্বাই, অগ্নি, অমৃত ভোগ, আলফাজ বোম্বাই, আতাউল আতা, আরিয়াজল, আরাজনমা, আলম শাহী, গিলা, গোলাপবাস, আনারস, ইলশাপেটি, কলাচিনি, কাঁচামিঠা, কালিয়া, কৃষ্ণচূড়া, টিক্কাফারাশ, টিয়াকাঠি, কালাপাহাড়ী, কালিভোগ, কালুয়া, কাঞ্চন খোসাল, কাজলা সিন্দুরী, কিষাণ ভোগ, কোহিনুর, কোহিতুর, কুয়া পাহাড়ী, টোফা, কাজল ফজলী, কাইয়া ডিপি, কাটাসি, গোলাপ খাস, গোলাপ বাস, গোল্লা, গুল্লি, গৌরজিত, গুলগুল্লি, চেপি, চরবসা, চম্পা, চন্দন খোস, চিনি কালাম, চিনি বড়ই, চিনি পাতা, ছাবিয়া, ছানাছুর, ছফেদা, জালী বান্ধা, ভাংগা, জিলাপীর ক্যাড়া, জোয়ালা, জিতুভোগ, গোবিন্দভোগ, জর্দা, জর্দালু, বাওয়ানী, বাউনি লতা, তাল পানি, দার ভাংগা, দর্মন, দাদ ভোগ, দেউরী, দিলসাদ, দোফলা, দিল্লীর লাড়ুয়া, দুধিয়া, দেওভোগ, দুধসর, বড়বাবু, নারিকেলী, নারকেল পাথী, নয়নভোগ, প্রসাদ ভোগ, জিতুভোগ, সীতাভোগ, বোগলাগুলি, পাথুরিয়া, ফজলী কালান, ফনিয়া, বারমাসি, বোতল বেকি, বেতলা, বড় শাহী, বাতাসা, বাউই ঝুলি, বিড়া, বেগম পছন্দ, কমল পছন্দ, বেলখাস, বিমলা, বিশ্বনাথ, বোম্বাই কেতুল্লা, বদরুদ্দোজা, বোম্বাই গোপাল ভোগ, বোম্বাই খিরসা, বৌ ভূলানী, বৃন্দাবনী, সাহা পছন্দ, বাদশা ভোগ, ভাদুরী, ভবানী, ভবানী চৌরাস, ভারতী, মাল ভোগ, মাংগুড়া পাকা, মিসরীদাগী, সিরী ভোগ, মিসরী দানা, মিসরী কান্ড, ভূত বোম্বাই, মতিচুর, মোহন ভোগ, মোহন পছন্দ, রাজরানী, রাম প্রসাদ, রানী পছন্দ, কাজী পছন্দ, বিলুপছন্দ, রানী ভোগ, রাজ ভোগ, কালি ভোগ, জিবা ভোগ, লাক্ষো, লাদুয়া, লাড়ুয়া, লোরাল, লালমুন, লক্ষণ ভোগ, লতা খাট, লতা বোম্বাই, নাবী বোম্বাই, লোহাচুর, শ্যাম লতা, রসবতী, সাটিয়ার ক্যাড়া, সাদাপাড়া, সবজা, সুবা পছন্দ, শাহী পছন্দ, সরিখাস, শরিফ খাস, সিন্দুরী, সারাবাবু, শোভা পছন্দ, সুলতান পছন্দ, সফদর পছন্দ, সূর্যপুরী, সুরমাই ফজলী, হায়াতী, হিম সাগর, খুদি খিরসাপাত, ক্ষীরপুরি, ক্ষীরমন, ক্ষীর টাটটি, ক্ষীর বোম্বাই, খান বিলাস, বাতাসা, মানহারা, পাথুরিয়া, তোহ্ফা, ফেনিয়া, মধুচুষাকি, মধুমামি, নকলা, মোহিনিসিন্দুরী, ভুজাহাড়ি, সন্ধ্যাভারুতি, পদ্মমধু, অমৃতভোগ, লতারাজ, বৃন্দাবনি ইত্যাদি।

বিদেশী আম : আব্দুল আজিজ, আলফানসো, আলী চৌরস, আম্রপালী, আমবাজন, আমন দাশেহারী, মল্লিকা, চৌসা, তোতাপুরী, বোম্বাই গ্রীন, আনানাস খাশ, আনোয়ার রাতাউল, আনোয়ার আতাউল, আগমামাশু, আওবেক, ইরউইন, কেন্ট, কেনসিংটন, কেইট, কারাবাও, কাইটুক, পিকো, পকনা, পাহুতান, ছিদরালী, ছওসি, জাওনিয়া, ঝিল, ডক্টর পছন্দ, দিল রৌশন, দিল বাহার, দিল ওয়ালা, দালুয়া, চন্দ্রকরণ, কেরি, বোয়ার, ফ্লোরিগ্যান, জিলেট, ভাদুরী, দাসেহারী, ধুপা, নীল উদ্দিন, নোড়া, নাম-ডক-মাই, নওয়াব পছন্দ, নিলাম্বরী, পীরের ফলী, রওশান টাকী, পালমার, পাহুতান, বেগম ফুলি, ভূলীয়া, মালদপাহি, মালগোবা, মাদ্রাজী, মিঠুয়া পাটনা, রাগ, র‍্যাড, রুবি, রত্না, লাভ-ই-মশগুল, লিটল ফ্লাওয়ার, সবদেরাজ, সামার বেহেস্ত, সামার বেহেস্ত চৌসা, সাদওয়ালা, সুকুর খন্দ, সেভেন-ইন-ওয়ান, সুগার কিং, হিটলার পছন্দ, হেডেন, বানানা আম, টমি এটকিনস, জিনহুয়াং, জিনসুই, জিহুয়া, গুইরা, হং শিয়াং ইয়া, তাইনং নমস্বর-১, চোকানান, ডট, ডানকুন, এডওয়ার্ড, সেনসেশন, এলডন, ফ্যাসেল, ফোর্ড, গোল্ড নাগেট, আইভোরি, জাকার্তা, পারভিন, অসটিন, সান-ই-খোদা, সানসেট, গেডং, গোলেক, মালগোয়া, মাসমুদা, প্রায়র, কেরালাডোয়ার্ফ, ওনো, জিল, নীলাম, টংডোম, দাশেহারী, হানিগোল্ড এবং আরুমানিস।

শুধু আমের বাইরের আকার আকৃতি যে ভিন্ন রকমের তা নয়। আমের ভিতরের রং-এ রয়েছে বৈচিত্রতা। যেমন–হলুদ, কমলা, ফ্যাকাসে হলুদ, গাঢ় হলুদ, কমলাভ হলুদ ইত্যাদি।

আমের কয়েকশো নামের ভিড়ে আপনি হয়তবা একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছেন যে কোন জাতই বা ভালো

ও সুস্বাদু। এক কথায় বলতে গেলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে যে সকল জাতগুলো মুক্তায়ন করা হয়েছে এবং বাণিজ্যিকভাবে চাষকৃত জাতগুলোই তুলনামূলকভাবে ভাল ও গুণগতমানসম্পন্ন এবং আপনারা নিজের বাগানের জন্য সেই জাতগুলো প্রথমে পছন্দ করবেন। তবে সব আমের জাত সকল এলাকার জন্য উপযুক্ত নয়। পরামর্শ হলো আপনার পছন্দকৃত জাতটি আপনার এলাকায় হবে কি না তা অবশ্যই লাগানোর পূর্বেই নিশ্চিত হতে হবে।

পরিশেষে, ভালো ও নিরাপদ আম সহজলভ্য হোক দেশের সকলের জন্য এই প্রত্যাশাই গবেষকের।

লেখক পরিচিতি : ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, চাঁপাই নবাবগঞ্জ

তারা চেনার মজা

– সৌমেন সাহা

সূর্য পূর্বদিকে ওঠে আর পশ্চিমদিকে অস্ত যায়। এটা হয় পশ্চিম থেকে পূর্বের পৃথিবীর অক্ষাবর্তনের জন্য। কিন্তু শুধু সূর্য নয়, চাঁদও পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য পূর্বে উঠে পশ্চিমে অস্ত যায়। আকাশের তারাদেরও পূর্ব থেকে পশ্চিমে পৃথিবীকে পাক খেতে দেখা যায়। মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ইত্যাদি গ্রহগুলোও পূর্বে ওঠে পশ্চিমে ডোবে। এসবই পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফল। আমাদের স্কুলপাঠ্য ভূগোল বইগুলোতে পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলাফল হিসাবে সূর্যের দৈনিক উদয়অস্ত তথা দিনরাত্রির পালাবদলের কথা বলা আছে। কিন্তু পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য চাঁদ, গ্রহ এবং তারারাও যে রোজ পূর্বে ওঠে আর পশ্চিমে ডোবে সেই বিষয়টার উল্লেখ নেই।

সূর্য, চাঁদ, গ্রহ এবং তারাদের পূর্ব-পশ্চিমে দৈনিক আবর্তনের (আপাত) কিছুটা তফাৎ আছে। সূর্যকে আমরা ২৪ ঘন্টায় পৃথিবীর চারদিকে এক পাক খেতে দেখি। চাঁদকে ২৪ ঘন্টা ৫০ মিনিটে এবং তারাদের ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিটে পৃথিবীর চারদিকে এক পাক খেতে দেখা যায়। এই পার্থক্যের কারণ কি ? এই প্রশ্নের উত্তর যার জানা নেই তাকে বলব এখনই না জানলেও চলবে। আগে প্রাথমিক তথ্যগুলোর সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। আকাশ দেখুন। গ্রহতারা চিনুন। নিয়মিত লক্ষ্য করুন ওদের গতি। তত্ত্ব, ব্যাখ্যা–ওগুলো পরে হবে।

কালপুরুষ একটি অতি পরিচিত তারামণ্ডল। নীচের ছবিতে (চিত্র-১) কালপুরুষ এবং তার সংলগ্ন তারামণ্ডলগুলো দেখানো হয়েছে ফাল্গুন মাসে সন্ধ্যার আকাশে। কালপুরুষকে দেখা যায় প্রায় মাথার উপরে, কিছুটা দক্ষিণে। একবার দেখলেই তার শিকারীর মতো চেহারাটা মনে গেঁথে যায়। বাঁম কাঁধের আর্দ্রা তারাটি তামাটে এবং খুব উজ্জ্বল। ডান পায়ের বাণরাজা উজ্জ্বল নীল রঙের তারা। তিনটি উজ্জ্বল তারা দিয়ে কোমরের বেল্ট, সেখান থেকে তরবারি ঝুলছে। মাথায় কোন উজ্জ্বল তারা নেই, আছে তিনটি খুব অনুজ্জ্বল তারা দিয়ে গঠিত একটি ক্ষুদ্র ত্রিভূজ। কালপুরুষের কিছুটা দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে বৃহৎ কুকুরমণ্ডল। এই মণ্ডলের লুব্ধক (Sirius) আকাশের উজ্জ্বলতম (দৃশ্যত) তারা। কালপুরুষের উত্তর-পশ্চিমে বৃষ রাশি, আর পূর্বে মিথুন রাশি।

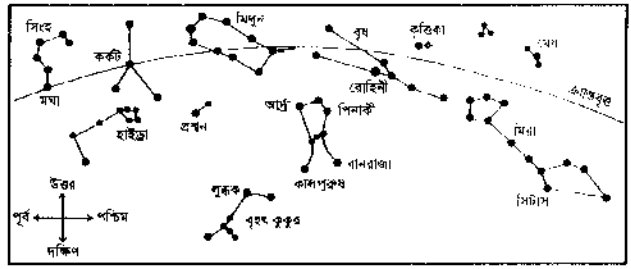

চিত্র-১ : কালপুরুষ এবং তার সন্নিহিত কয়েকটি তারামণ্ডল

শুধু ফাল্গুন-চৈত্র মাসেই নয়, প্রায় সারাবছরই কালপুরুষকে দেখা যায়। কালপুরষ রোজই পূর্বে ওঠে আর পশ্চিমে অস্ত যায়। শুধু ইংরেজী জুন মাসে কালপুরুষ অদৃশ্য থাকে। এর কারণ জুন মাসে সূর্য চলে আসে কালপুরুষের কাছে–বৃষ আর মিথুন রাশির মাঝে, কালপুরুষের একটু উত্তরে। তখন কালপুরুষ

সকালে সূর্যের সঙ্গে ওঠে আর সন্ধ্যায় সূর্যের সঙ্গে অস্ত যায়। তাই তখন রাতের আকাশে কালপুরুষকে দেখা যায় না। সর্বদা সূর্যের পাশে থেকে ঘোরে বলে দিনের বেলাতেও সে সূর্যালোকে অদৃশ্য। এ হল কালপুরুষের সৌরসংযোগ।

জুলাই মাসে কালপুরুষ সূর্যোদয়ের আগেই ভোরবেলা পূর্ব আকাশে ওঠে। তারপর কালপুরুষের উদয় রোজ একটু একটু করে এগিয়ে আসে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে (শরৎকালে) কালপুরুষ ওঠে প্রায় মাঝরাতে। তখন মাঝরাতে পূর্বে ওঠে ভোরবেলায় কালপুরুষ চলে আসে প্রায় মাথার উপর। ডিসেম্বর মাসে কালপুরুষের উদয় আরো ঘন্টা ছয়েক এগিয়ে আসে। শীতকালে সন্ধ্যাবেলায় কালপুরুষের উদয় হয়। কালপুরুষ তখন আকাশে সূর্যের উল্টোদিকে থাকে, সূর্য যখন পশ্চিমদিকে অস্ত যায় কালপুরুষ তখন পূর্বদিকে ওঠে। মার্চ-এপ্রিল মাসে কালপুরুষের উদয় সন্ধ্যা থেকে আরো ঘন্টা ছয়েক এগিয়ে আসে, কালপুরুষ তখন ওঠে দুপুরবেলায়। রোদের জন্য তখন তাকে দেখা যায় না। কিন্তু দুপুরবেলায় পূর্বে উঠলে সন্ধ্যার সময় সে চলে আসে মাথার উপর (একটু দক্ষিণ ঘেঁষে)। আমরা বইয়ে পড়েছি ফাল্গুন-চৈত্র মাসে সন্ধ্যাবেলায় দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশে কালপুরুষকে দেখা যায়। রোজ সন্ধ্যায় কালপুরুষকে দেখতে থাকুন। দেখবেন সে রোজ একটু একটু করে সূর্যের দিকে (সন্ধ্যায় সূর্য থাকে পশ্চিম দিগন্তের একটু নীচে) সরে যাচ্ছে। তারপর জুন মাসে সন্ধ্যায় সে পশ্চিম দিগন্তে সূর্যের সঙ্গে সৌরসংযোগে অদৃশ্য হয়। এইভাবে পশ্চিম আকাশে অদৃশ্য হয়ে যাওয়াকে বলে কালপুরুষের সূর্যাভিগ অস্তগমন (heliacal setting)। পুনরায় জুলাই মাসে ভোরবেলায় সূর্যোদয়ের আগে পূর্ব আকাশে কালপুরুষের দেখা দেয়াকে বলে সূর্যাতিগ উদয় (heliacal rising)। জুন মাসে সূর্য অবশ্য কালপুরুষের একেবারে গায়ে আসে না, থাকে কালপুরুষের একটু উত্তরে, বৃষ আর মিথুনরাশির মাঝে।

ধরুন আজ রাত ৮ টায় আপনি আকাশের কোন একটা তারাকে মাথার উপড়ে দেখলেন। তাহলে কাল রাত ৪ টা ৪ মিনিট আগেই অর্থাৎ ৭ টা বেজে ৫৬ মিনিটে সেই তারটি পুনরায় মাথার উপর চলে আসবে। কারণ তারারা ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিটে পৃথিবীর চারিদিকে একবার আবর্তন (আপাতঃ) করে। অতএব, আগামীকাল রাত ৮ টায় তারাটিকে মাথার উপর থেকে একটু (প্রায় ১ ডিগ্রি) পশ্চিমে দেখবেন। তার পরের দিন রাত ৮ টায় আপনি দেখবেন তারাটি আরো এক ডিগ্রি পশ্চিমে সরে গেছে। রোজ এক ডিগ্রি করে সরলে তিনমাসে প্রায় ৯০ ডিগ্রি সরে যায়। তাই তিন মাস পরে রাত ৮ টায় তারাটি পশ্চিম দিগন্তে চলে যাবে। তখন তারাটিকে দেখা যাবে না। এক বছর পরে রাত ৮ টায় আবার তাকে মাথার উপরে দেখা যাবে। এমনটি ঘটে আসলে সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্য।

এসব দেখতে ভালো লাগে। রোজ সন্ধ্যায় আকাশ দেখুন। দেখবেন তারামণ্ডলগুলো রোজ একটু একটু করে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে। আজ সন্ধ্যায় আকাশ দেখুন, ছয় মাস পরে সন্ধ্যায় আবার দেখুন, দেখবেন সেই তারাগুলো নেই, তার উল্টোদিকের তারাগুলো উপরে উঠে এসেছে। একবছর পরে সন্ধ্যার আকাশের চিত্রটা আবার আগের মতই হয়ে যায়। আকাশ দেখলেই সব বুঝবেন। তারারা রোজ ১ ডিগ্রি করে পশ্চিমে এগিয়ে যায়। অথবা বলতে পারেন সূর্য তারাদের পটভূমিতে পশ্চিম থেকে পূর্বে রোজ ১ ডিগ্রি করে চলে। এক তারা ছেড়ে অন্য তারায় যেতে যেতে পশ্চিম থেকে পূর্বে সমগ্র খ-গোল ঘুরে একটি পূর্ণবৃত্ত রচনা করে সূর্য আবার আগের তারাটির কাছে ঘুরে আসে এক বছর পর।

অক্টোবর মাসের সন্ধ্যার আকাশটা কেমন দেখায় দেখুন (চিত্র-২) দক্ষিণ দিকে মুখ করে দাঁড়ান। ছবিটা মাথার উপরে তুলে ধরুন। ছবির ম্যাপটা যেন আকাশ। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম মিলিয়ে নিন। আপনার সামনের দিক দক্ষিণ, পিছনের দিক উত্তর, ডান দিক পশ্চিম আর বাম দিক পূর্ব। ভূপৃষ্ঠের ম্যাপের মত

সকালে সূর্যের সঙ্গে ওঠে আর সন্ধ্যায় সূর্যের সঙ্গে অস্ত যায়। তাই তখন রাতের আকাশে কালপুরুষকে দেখা যায় না। সর্বদা সূর্যের পাশে থেকে ঘোরে বলে দিনের বেলাতেও সে সূর্যালোকে অদৃশ্য। এ হল কালপুরুষের সৌরসংযোগ।

জুলাই মাসে কালপুরুষ সূর্যোদয়ের আগেই ভোরবেলা পূর্ব আকাশে ওঠে। তারপর কালপুরুষের উদয় রোজ একটু একটু করে এগিয়ে আসে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে (শরৎকালে) কালপুরুষ ওঠে প্রায় মাঝরাতে। তখন মাঝরাতে পূর্বে ওঠে ভোরবেলায় কালপুরুষ চলে আসে প্রায় মাথার উপর। ডিসেম্বর মাসে কালপুরুষের উদয় আরো ঘন্টা ছয়েক এগিয়ে আসে। শীতকালে সন্ধ্যাবেলায় কালপুরুষের উদয় হয়। কালপুরুষ তখন আকাশে সূর্যের উল্টোদিকে থাকে, সূর্য যখন পশ্চিমদিকে অস্ত যায় কালপুরুষ তখন পূর্বদিকে ওঠে। মার্চ-এপ্রিল মাসে কালপুরুষের উদয় সন্ধ্যা থেকে আরো ঘন্টা ছয়েক এগিয়ে আসে, কালপুরুষ তখন ওঠে দুপুরবেলায়। রোদের জন্য তখন তাকে দেখা যায় না। কিন্তু দুপুরবেলায় পূর্বে উঠলে সন্ধ্যার সময় সে চলে আসে মাথার উপর (একটু দক্ষিণ ঘেঁষে)। আমরা বইয়ে পড়েছি ফাল্গুন-চৈত্র মাসে সন্ধ্যাবেলায় দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশে কালপুরুষকে দেখা যায়। রোজ সন্ধ্যায় কালপুরুষকে দেখতে থাকুন। দেখবেন সে রোজ একটু একটু করে সূর্যের দিকে (সন্ধ্যায় সূর্য থাকে পশ্চিম দিগন্তের একটু নীচে) সরে যাচ্ছে। তারপর জুন মাসে সন্ধ্যায় সে পশ্চিম দিগন্তে সূর্যের সঙ্গে সৌরসংযোগে অদৃশ্য হয়। এইভাবে পশ্চিম আকাশে অদৃশ্য হয়ে যাওয়াকে বলে কালপুরুষের সূর্যাভিগ অস্তগমন (heliacal setting)। পুনরায় জুলাই মাসে ভোরবেলায় সূর্যোদয়ের আগে পূর্ব আকাশে কালপুরুষের দেখা দেয়াকে বলে সূর্যাতিগ উদয় (heliacal rising)। জুন মাসে সূর্য অবশ্য কালপুরুষের একেবারে গায়ে আসে না, থাকে কালপুরুষের একটু উত্তরে, বৃষ আর মিথুনরাশির মাঝে।

ধরুন আজ রাত ৮ টায় আপনি আকাশের কোন একটা তারাকে মাথার উপড়ে দেখলেন। তাহলে কাল রাত ৪ টা ৪ মিনিট আগেই অর্থাৎ ৭ টা বেজে ৫৬ মিনিটে সেই তারাটি পুনরায় মাথার উপর চলে আসবে। কারণ তারারা ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিটে পৃথিবীর চারিদিকে একবার আবর্তন (আপাতঃ) করে। অতএব, আগামীকাল রাত ৮ টায় তারাটিকে মাথার উপর থেকে একটু (প্রায় ১ ডিগ্রি) পশ্চিমে দেখবেন। তার পরের দিন রাত ৮ টায় আপনি দেখবেন তারাটি আরো এক ডিগ্রি পশ্চিমে সরে গেছে। রোজ এক ডিগ্রি করে সরলে তিনমাসে প্রায় ৯০ ডিগ্রি সরে যায়। তাই তিন মাস পরে রাত ৮ টায় তারাটি পশ্চিম দিগন্তে চলে যাবে। তখন তারাটিকে দেখা যাবে না। এক বছর পরে রাত ৮ টায় আবার তাকে মাথার উপরে দেখা যাবে। এমনটি ঘটে আসলে সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্য।

এসব দেখতে ভালো লাগে। রোজ সন্ধ্যায় আকাশ দেখুন। দেখবেন তারামণ্ডলগুলো রোজ একটু একটু করে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে। আজ সন্ধ্যায় আকাশ দেখুন, ছয় মাস পরে সন্ধ্যায় আবার দেখুন, দেখবেন সেই তারাগুলো নেই, তার উল্টোদিকের তারাগুলো উপরে উঠে এসেছে। একবছর পরে সন্ধ্যার আকাশের চিত্রটা আবার আগের মতই হয়ে যায়। আকাশ দেখলেই সব বুঝবেন। তারারা রোজ ১ ডিগ্রি করে পশ্চিমে এগিয়ে যায়। অথবা বলতে পারেন সূর্য তারাদের পটভূমিতে পশ্চিম থেকে পূর্বে রোজ ১ ডিগ্রি করে চলে। এক তারা ছেড়ে অন্য তারায় যেতে যেতে পশ্চিম থেকে পূর্বে সমগ্র খ-গোল ঘুরে একটি পূর্ণবৃত্ত রচনা করে সূর্য আবার আগের তারাটির কাছে ঘুরে আসে এক বছর পর।

অক্টোবর মাসের সন্ধ্যার আকাশটা কেমন দেখায় দেখুন (চিত্র-২) দক্ষিণ দিকে মুখ করে দাঁড়ান। ছবিটা মাথার উপরে তুলে ধরুন। ছবির ম্যাপটা যেন আকাশ। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম মিলিয়ে নিন। আপনার সামনের দিক দক্ষিণ, পিছনের দিক উত্তর, ডান দিক পশ্চিম আর বাম দিক পূর্ব। ভূপৃষ্ঠের ম্যাপের মত

ডানে পূর্ব আর বাঁমে পশ্চিম হবে না। তাহলে মেলাতে পারবেন না। এটা আকাশের ম্যাপ, মাটির নয়। ছবিটা মাথার উপর তুলে দিকগুলো মিলিয়ে নিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ম্যাপে দেখুন ধনু, মকর এবং কুম্ভরাশিকে দেখা যাচ্ছে। ধনুরাশির তারাগুলো খুব উজ্জ্বল। এই তারাগুলো দিয়ে সহজেই তীর আর ধনুক ফুটিয়ে তোলা যায়। মকর রাশির আকার 'ব'-এর মতো, তারাগুলো অনুজ্জ্বল। কুম্ভরাশিতে কলসির আকার নিশ্চয় খুঁজে পাচ্ছেন। আমি অবশ্য ওটাকে কচ্ছপের মতো ভাবতে ভালোবাসি। কুম্ভরাশির তারাগুলো তেমন উজ্জ্বল নয়। অ্যাকুইলামণ্ডলের উজ্জ্বল তারা শ্রবনাকে (Altair) সহজেই খুঁজে পাবেন-তার দুদিকে দুটি অনুজ্জ্বল তারা। ঐ তিনটি তারার সংযোজক রেখাটিকে সোজা দক্ষিণে বাড়িয়ে দিলে মকররাশির মাথায় গিয়ে পৌঁছায়, সেখানে দেখুন দুটি তারা যেন প্রায় গায়ে গায়ে লেগে আছে। লাইয়ারামমণ্ডলের অভিজিৎ (Vega) তারাকে চিনে রাখুন, খুব উজ্জ্বল।

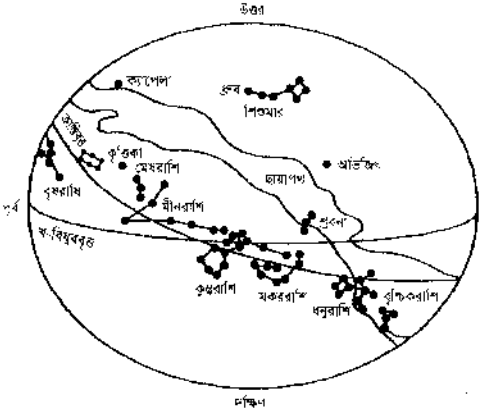

চিত্র-২ : অক্টোবর মাসের সন্ধ্যার আকাশ

অক্টোবর মাসের সন্ধ্যাবেলার আকাশের ছবি দেখালাম। আগষ্ট মাসের মধ্যরাতেও আকাশের এই ছবিটাই দেখবেন। তারাদের উদয় রোজ ৪ মিনিট করে এগিয়ে এলে এক মাসে ২ ঘন্টা আর ৩ মাসে ৬ ঘন্টা এগিয়ে আসে। আগষ্ট মাসে মধ্যরাতে যে তারাগুলো দেখা যায়, তিন মাস পরে নভেম্বর মাসে সন্ধ্যাবেলাতেই আপনি তাদের দেখতে পাবেন। মে মাসের ভোরের আকাশপটটাও একই।

ধ্রুবতারাকে চেনেন তো ? আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন চিনতাম না। কেউ দেখিয়ে দেয়নি। কবে প্রথম চিনেছিলাম ঠিক মনে নেই। ধ্রুবতারার একদিকে সপ্তর্ষিমণ্ডল, অন্যদিকে ক্যাসিওপিয়া। সপ্তর্ষিমণ্ডল আর ক্যাসিওপিয়া ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করে সর্বদা বৃত্তাকারে ঘুরে চলে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিটে এক পাক খায়। মাঝখানে ধ্রুবতারা স্থির। ধ্রুবতারা স্থির থাকে কেন? আগেই বলেছি সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারার পূর্ব-পশ্চিমে দৈনিক আবর্তন প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম থেকে পূর্বে পৃথিবীর অক্ষাবর্তনের ফল। পৃথিবীর ঘূর্ণাক্ষটাকে (সুমেরু ও কুমেরুগামী পৃথিবীর ব্যাস) আকাশে বাড়িয়ে দিলে ধ্রুবতারা স্থির। ধ্রুবতারা হলো ক্ষুদ্র ভল্লুকমণ্ডলের (ursa minor) উজ্জ্বলতম তারা। ক্ষুদ্র ভল্লুকমণ্ডলকে বাংলায় বলে লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডল বা শিশুমারামণ্ডল। সপ্তর্ষিমণ্ডলে সাতটি উজ্জ্বল তারা জিজ্ঞাসা চিহ্নটি সহজেই চেনা যায়। পাশ্চাত্যে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে বলে big dipper বা বড় পেয়ালা। সাতটি উজ্জ্বল তারা দিয়ে একটি লম্বা হাতলযুক্ত পেয়ালার ছবি সহজেই ফুটিয়ে তোলা যায়। ঐ সাতটি তারাকে নিয়ে একটি লাঙ্গলের আকারও কল্পনা

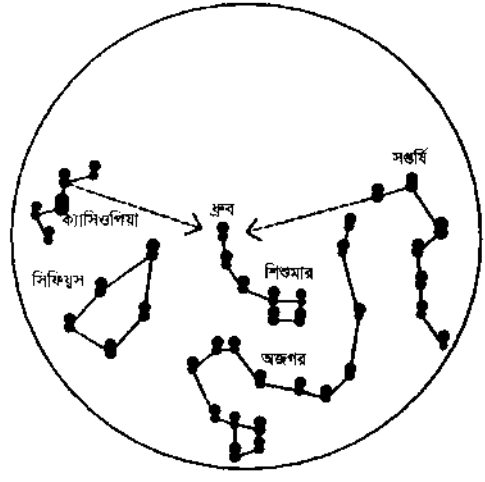

চিত্র-৩ : ধ্রুবতারা সন্নিহিত কয়েকটি তারামণ্ডল

করতে পারেন। সপ্তর্ষিমণ্ডলকে বৃহৎ ভল্লুকমণ্ডলও (ursa major) বলে। ঐ সাতটি উজ্জ্বল তারা ভালুকটার লেজ মাত্র (বাস্তবে ভালুকের লেজ অবশ্য খুব ছোট)। আশেপাশের অনেকগুলো অনুজ্জ্বল তারা নিয়ে সম্পূর্ণ বৃহৎ ভালুকটা ফুটিয়ে তোলা যায়। কিন্তু সেটা তেমন আকর্ষণীয় নয়।

ধ্রুবতারাকে আকাশের কোথায় দেখবেন? আপনার স্থানের অক্ষাংশ যত ডিগ্রি, ধ্রুবতারাকে উত্তর দিকে দিগন্তরেখা থেকে তত ডিগ্রি উপরে দেখবেন। প্রতি ১১০ কিমি উত্তরে যাওয়ার জন্য ধ্রুবতারা ১ ডিগ্রি করে উপরে ওঠে। এটা হয় পৃথিবী গোলাকার বলে। উত্তর মেরুতে গেলে ধ্রুবতারা চলে আসবে একেবারে আপনার মাথার উপর। দেখবেন মাথার উপর ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করে আকাশের সমস্ত তারা অনুভূমিক বৃত্তাকারে ঘুরছে। উত্তর মেরুতে তারাদের উদয়-অস্ত নেই। সেখানে সূর্য এবং চাঁদকেও অনুভূমিক বৃত্তাকারে ঘুরতে দেখা যাবে। এর থেকে আপনি বুঝতে পারবেন মেরু অঞ্চলে কেমন করে ৬ মাস দিন আর ৬ মাস রাত হয়।

বাড়ি থেকে যত দক্ষিণে যাবেন উত্তর আকাশের ধ্রুবতারা তত দিগন্তরেখার দিকে নামতে থাকবে। নিরক্ষরেখার অক্ষাংশ শূন্য ডিগ্রি তাই নিরক্ষরেখায় গেলে ধ্রুবতারা দিগন্তরেখায় মিশে যায়। আরো দক্ষিণে গেলে ধ্রুবতারা উত্তর দিগন্তে ডুব দিয়ে মিলিয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়া ছাড়িয়ে আরো দক্ষিণে গেলে শুধু ধ্রুবতারাই নয় সপ্তর্ষিমণ্ডল, ক্যাসিওপিয়া ইত্যাদিও অদৃশ্য হয়ে যাবে। দক্ষিণ মেরুতে গিয়ে দাঁড়ালে যে তারামণ্ডলটি আপনার মাথার উপর আসবে তার নাম অক্টান্স (octans)। অক্টান্সে কোন উজ্জ্বল তারা নেই। দক্ষিণ গোলার্ধে আমাদের মতো উজ্জ্বল মেরুতারা নেই। তবে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে থেকে ওদের দেখা যায় না।

আকাশকে একটি ফাঁপা গোলকের মতো দেখায়, একে খ-গোলক (celestial sphere) বলে। এর অর্ধেকটা দিগন্তরেখার উপরে, অর্ধেকটা নীচে। এই ফাঁপা গোলকটির ভিতরে তারাগুলো যেন বসানো। আকাশটা এমন ফাঁপা গোলাকের মতো দেখায় কেন? প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন তারা বিভিন্ন দূরত্বে আছে। তবু চোখে দেখে আমরা সেটা বুঝতে পারি না। কারণ অত দূরে আমাদের দৃষ্টির গভীরতা (depth of vision) কাজ করে না। আমাদের মনে হয় সব তারাই সমান দূরে-সবাই অনেক দূরে। সূর্য যে চাঁদের প্রায় ৪০০ গুণ দূরে, খালি চোখে দেখে সেটা কি কেউ অনুমান করতে পারেন? সবকিছু সমান দূরে মনে হয় বলে আকাশটা ফাঁপা গোলাকের মতো দেখায়।

দিনের বেলায় তারাদের দেখা যায় না কেন? সবাই জানেন সূর্যের আলোর তীব্রতায় তারারা ঢাকা পড়ে যায়। তবে বিষয়টা আর একটু বোঝার আছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল না থাকলে দিনের বেলাতেও তারাদের দেখা সম্ভব হত। মনে করুন এখন সকাল ৮ টা। সূর্য পূর্ব আকাশে। তাহলে পশ্চিম আকাশের তার দেখতে অসুবিধা কোথায়? বায়ুমণ্ডলে বাতাসের কণাগুলো সূর্যের আলোর বিক্ষেপণ (scattering) ঘটায়। বাতাসের একটা অণুর উপরে আলো পড়ে আর সেই আলো ঠিকরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে সারা আকাশ আলোয় ভরে ওঠে। তাই তারারা ঢাকা পড়ে যায়।

দিনের আকাশ নীল দেখায় কেন? এর কারণও বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডলের অনুগুলো সূর্যের আলোর সাতটা রঙের মধ্যে নীল রঙটারই সবচেয়ে বেশি বিক্ষেপণ (scattering) ঘটায়। বায়ুমণ্ডল না থাকলে দিনের আকাশ কালো দেখাতো।

তারারা মিটমিট করে আর গ্রহরা করে না-কোন শ্রেণীতে বিজ্ঞান বইয়ে একথা পড়েছিলাম। কিন্তু ছাত্রজীবনে জিনিসটা কখনো ভালো করে দেখি নি। এরজন্য দরকার ছিল একটি গ্রহ আর একটি তারাকে ভালো করে পাশাপাশি দেখার। কিন্তু গ্রহ চিনিয়ে দেবে কে? আমি ভাবতাম সব তারাই বুঝি ঝিকমিক করে এবং তাকিয়ে দেখলেই তা বোঝা যাবে। আমি ছেলেবেলায় কখনো কখনো আকাশের কোনো একটা তারার

দিকে চেয়ে দেখতাম আর ভাবতাম, "ঐ তো ঝিকমিক করছে !" বাস্তবে সেটা তেমন ঝিকমিক করুক আর নাই করুক। প্রকৃতপক্ষে সব তারার ঝিকিমিকি সমান নয়। তারাদের ঝিকিমিকি যদি আপনি ভালো করে দেখতে চান তো আপনাকে একটি উজ্জ্বল তারা বেছে নিতে হবে, আর তারাটি যখন দিগন্তরেখার কাছে তখন তাকে দেখতে হবে। তারাটি উপরে উঠে এলে তার ঝিকিমিকি কমে। যে তারার উজ্জ্বলতা কম সেটা ঝিকিমিকি করে কিনা বোঝা শক্ত। উজ্জ্বল লাল তারা স্বাতীকে সন্ধ্যায় পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যেতে দেখেছেন? তার ঝিকিমিকিটা তখন দেখার মতো। স্বাতীকে চিনে নিন। সপ্তর্ষিমণ্ডলের জিজ্ঞাসা চিহ্নের শেষদিকটা সোজা বাড়িয়ে দিলে কিছু দূরে যে খুব উজ্জ্বল লাল রঙের তারাটিতে গিয়ে পড়ে সেটাই স্বাতী (arcturus)। তারার ঝিকিমিকি মানে শুধু উজ্জ্বলতার বাড়া-কমাই নয়। মনে হবে তারাটা নড়ছে, লাফাচ্ছে, দাপাদাপি করছে-যেন জ্যান্ত! তারাটা যেন কম্পনশীল, যেন এপাশে ওপাশে নাচানাচি করছে। তার সঙ্গে বর্ণের পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। ঝিকিমিকি তারাকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে।

তারাদের ঝিকিমিকির কারণ কি ? এর কারণও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডল না থাকলে তারারা স্থির হয়ে জ্বলত। তারার আলো নানা ঘনত্বের অনেক বায়ুস্তর ভেদ করে আমাদের চোখে এসে পৌঁছায়। আলোকরশ্মি বায়ুমণ্ডলে প্রতিসরণের জন্য কিছুটা বেঁকে যায়। এর ফলে তারাটিকে আমরা যথাস্থানে দেখি না, কিছুটা পাশে দেখি। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের ঘনত্ব ও তাপমাত্রার সূক্ষ্ম পরিবর্তন প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে। এর ফলে তারা থেকে আসা আলোকরশ্মির প্রতিসরণের মাত্রাভেদ ঘটে। সেজন্য তারাটিকে প্রতিনিয়ত নানা স্থানে দেখায় নড়ছে বলে মনে হয়। সেই সঙ্গে তার উজ্জ্বলতারও হ্রাসবৃদ্ধি হয়। বর্ণেরও পরিবর্তন হয় চমকে চমকে। দিগন্তরেখার কাছাকাছি তারার ঝিকিমিকি বেশী হয়। কারণ সেক্ষেত্রে তারার আলো অনেক বেশী বায়ুস্তর ভেদ করে আমাদের চোখে পৌঁছায়।

সূর্য, চাঁদ এবং গ্রহরা ঝিকিমিক করে না কেন ? বহু পাঠ্যপুস্তকে এর ভুল ব্যাখ্যা দেয়া আছে। যেমন—একটি ভূগোলের বইয়ে আছে, "সূর্য একটি নক্ষত্র হলেও সূর্য থেকে পৃথিবী অনেক কাছে থাকায় সূর্যের আলো অনেক কম দূরত্ব অতিক্রম করে সরাসরি আমাদের চোখে এসে পড়ে, তাই আমারা সূর্যের আলোকে স্থির দেখি।" গ্রহরা কেন ঝিকিমিক করে না সে ব্যাপারে ঐ একই বইয়ে আছে, "গ্রহরা নক্ষত্রদের চাইতে পৃথিবীর অনেক কাছে আছে বলে এদের থেকে অনেকটা বেশী পরিমাণ আলো সরাসরি এসে আমাদের চোখে পড়ে ফলে আমরা গ্রহদের একটানা আলোই দেখতে পাই।" শুধু অপব্যাখ্যা নয়, এটা চিন্তাহীনতার চূড়ান্ত হয়ে গেল ! বেশী পরিমাণ আলো চোখে এলে ঝিকিমিকি বেশী হবে, কম নয়। কারণ সেক্ষেত্রে ঝিকমিক করাটা খুব সহজেই বোঝা যাবে। সূর্য এবং গ্রহদের আলোও নক্ষত্রদের আলোর মতোই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আমাদের চোখে আসে, সরাসরি এসে পড়ে না। তাহলে গ্রহদেরও তো ঝিকমিক করা উচিত। হ্যাঁ, উচিতই ! একটা গ্রহের প্রতিটি বিন্দু ঝিকমিক করে। গ্রহরা দেখতে চাকতির মতো। সূর্য আর চাঁদকে খালি চোখেই চাকতির মতো দেখায়। গ্রহদের চাকতির মতো চেহারা দেখা যায় দূরবিনে। ঐ চাকতির প্রতিটি বিন্দুর ঝিকমিকি এক ছন্দে, এক দশায় হয় না, এলোমেলোভাবে হয়। যদি কোন গ্রহের চাকতির প্রতিটি বিন্দুর উজ্জ্বলতা একসঙ্গে বাড়তে আর কমত তাহলে সেটা যেন জ্বলত আর নিভত, মারাত্মক ঝিকমিক করত। কিন্তু বিভিন্ন বিন্দুর ঝিকমিকি এলোপাথাড়িভাবে হয় বলে একটা গড়পড়তা উজ্জ্বলতা আমরা দেখতে পাই, ঝিকিমিকি বোঝা যায় না।

গ্রহরা যে একেবারেই ঝিকমিক করে তা নয়। বুধকে মাঝে মাঝে ঝিকমিক করতে আমরা দেখি। এর কারণ বুধ গ্রহ খুব ছোট, বুধকে দেখা যায় দিগন্তরেখার খুব কাছে (কখনো সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে, কখনো সূর্যোদয়ের আগে পূর্ব আকাশে), বুধের উজ্জ্বলতাও মন্দ নয়, দিগন্তরেখার কাছে থাকায় দীর্ঘ বায়ুস্তর

ভেদ করে বুধের আলো আমাদের চোখে আসে। এইসব কারণে বুধ গ্রহ তারার মতো কিছুটা ঝিকমিক করে। এমনকি শুক্র গ্রহ যখন পৃথিবী থেকে দূরে সন্ধ্যায় পশ্চিম দিগন্তে কখনো কখনো তাকে খুব অল্প মিটমিটি করতে দেখা যায়। যত্ন নিয়ে দেখলে আপনিও দেখতে পাবেন।

তারার ছবি তারাচিহ্নের (*) মতো করে আঁকা হয় কেন ? তার কারণ তারারা প্রকৃতপক্ষে বিন্দুবৎ হলেও তাদের আসল চেহারাটা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। আমরা তাদের বড় দেখি, আর ঠিক গোল দেখি না, মনে হয় চারপাশ থেকে ছটা বেরুচ্ছে। এর সঙ্গে তারার ঝিকিমিকির কোন সম্পর্ক নেই। এমনটা দেখায় গ্রহদেরও। এর কারণ আমাদের চোখের লেন্সের তন্তুগুলোর অরীয় (radial) বিণ্যাস। লেন্সটা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ আর সব জায়গায় সমসত্ত্ব (homogeneous) নয়। লেন্সটা তৈরী অসংখ্য তন্তুর (fibres) সমন্বয়ে। সেগুলো এমনভাবে সাজানো যে সব জায়গা দিয়ে সমান আলো ঢোকে না। এজন্যই তারাদের অমন তারাচিহ্নের মতো দেখায়। তবে কেউ যেন মনে না করেন যে তারাদের একেবারে asterisk চিহ্নের (*) মতো দেখবেন। একটা উজ্জ্বল তারাকে দেখুন, মনে হবে তার গা থেকে নানা দিকে যেন রশ্মি বের হচ্ছে সেই সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় তার ঝিকিমিকি কিন্তু বৃহস্পতি বা শুক্রকে দেখুন–ঝিকিমিকি নেই, শুধু যেন গা থেকে নানাদিকে রশ্মি বেরিয়ে আসছে।

একটা গ্রহ বা তারাকে চোখে আপনি যেমন দেখেন তার আসল চেহারাটা তেমন নয়। এটা আমাদের চোখের ত্রুটি। তাহলে তাদের আসল চেহারাটা কি করে দেখবেন ? অনেকদিন আগে তার উপায়টা বলে গেছেন বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী বিজ্ঞানী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯)। একটি পোস্টকার্ড নিন। তার গায়ে সূঁচ দিয়ে একটি ছিদ্র করুন। পোষ্টকার্ডটা চোখের সামনে রেখে সেই ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে একটা উজ্জ্বল তারাকে দেখুন। তারাটিকে দেখবেন দূর আকাশে একটি বিন্দুর মত। চারপাশে ছটা দেখা যাবে না। এর কারণ তারার আলো পোষ্টকার্ডের ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে এসে লেন্সের একটুখানি অংশে পড়ে। লেন্সের একটু অংশকে সমসত্ত্ব মনে করা যায়।

গ্রহ আর তারা তফাৎ করবেন কি করে ? তারারা মিটিমিটি করে আর গ্রহরা করে না। কিন্তু তার চেয়েও অনেক মূলগত এবং গুরুত্বপূর্ণ তফাৎ হলো গ্রহরা স্থির তারাদের পটভূমিতে চলে বেড়ায়, এক তারা ছেড়ে অন্য তারার পাশে যায়। বৃহস্পতি গ্রহকে আজ যদি দেখেন মকর রাশিতে, এক বছর পরে দেখবেন কুম্ভ রাশিতে। এইভাবে সব গ্রহই তারাদের পটভূমিতে চলে বেড়ায়। কিন্তু তারাদের এমন গতি নেই। কালপুরুষের ডান কাঁধের লাল তারা আর্দ্রা কখনো কালপুরুষকে ছেড়ে অন্য তারামণ্ডলে যায় না। আকাশের সব তারাই ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিটে পৃথিবীর চারিদিকে একবার আবর্তন (আপাত) সম্পন্ন করে। তারা সবাই এক ঝাঁকে, এক ছন্দে ঘোরে। সেজন্য তারামণ্ডলির আকৃতি এবং পারস্পরিক অবস্থান বরাবর একই থেকে যায়। কিন্তু গ্রহরা তারাদের থেকে দলছুট হয়ে চলে। খালি চোখে আকাশে গ্রহ দেখা যায় পাঁচটি–বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি। এই গ্রহগুলোর সাথে মানুষের পরিচয় অতি প্রাচীনকাল থেকেই। দূরবিন আবিষ্কারের পর আধুনিককালে আরো তিনটি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে–ইউরেনাস (১৭৮১ সালে, আবিষ্কর্তা হর্শেল), নেপচুন (১৮৪৬ সালে, আবিষ্কর্তা গ্যালে) এবং প্লুটো (১৯৩০ সালে, আবিষ্কর্তা টমবো, যদিও প্লুটো এখন তার গ্রহত্ব হারিয়েছে)।

কালপুরুষ, সপ্তর্ষিমণ্ডল, বৃষ রাশি চিরকাল একই রকম থেকে যায় কেন ? প্রকৃতপক্ষে তারারা মোটেই স্থির নয়, প্রচণ্ড বেগে গতিশীল। কিন্তু এতই দূরে আছে যে পৃথিবী থেকে আমাদের জীবদ্দশার সীমিত সময়ে তাদের এই গতিটা চোখে পড়ে না। কিন্তু যত্ন নিয়ে পর্যবেক্ষণ আর মাপজোক করে বিজ্ঞানীরা জেনেছেন যে সপ্তর্ষিমণ্ডল, সিংহরাশি, কালপুরুষ–এদের চোহারা ধীরে ধীরে পাল্টাচ্ছে। পাল্টাচ্ছে অন্যান্য

তারামণ্ডলগুলোও। আজ থেকে এক লক্ষ বছর আগে তারামণ্ডলগুলোর চেহারা এমনটি ছিল না। আজ তাদের যে চেহারা, আজ থেকে এক লক্ষ বছর পরে তাদের চেহারায় তার থেকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে। এই জিনিষটাকে বলে তারার প্রকৃত গতি (proper motion)। বিষয়টি আবিষ্কারের কৃতিত্ব ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডম-হ্যালির (১৬৫৬-১৭৪২)।

জ্যোতির্বিজ্ঞান হলো প্রাচীনতম বিজ্ঞান। শুধু আনন্দ বা রোমাঞ্চের জন্যই নয়, হাতে কলমে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা প্রতিটি ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকশিক্ষিকার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এছাড়া বোঝা যাবে না প্রাকৃতিক ভূগোল, পদার্থবিজ্ঞান। বোঝা যাবে না বিজ্ঞানের ইতিহাস। আইনষ্টাইন বলেছেন, "যে ধীশক্তি ছাড়া আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞান অকল্পনীয় তা এসেছে প্রধানত নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে।" তাঁর এই কথাগুলোর মধ্যে যে অতিশয়োক্তি কিছু নেই পাঠক ধীরে ধীরে একদিন তা উপলব্ধি করবেন।

তারা চিনুন বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে আপনার মানের যোগসূত্র স্থাপিত হোক।

ঠিকানা : ৫২, হাজী মেহের আলী রোড, খুলনা, ই-মেইল ঃ sahasoumen024@gmail.com

সোলার প্যানেলের মন্ত্রকাহিনী

– কাজী মুহাম্মদ আরফাতুল ইসলাম

আমরা অনেকেই হয়তো সোলার প্যানেলের (বা সৌর কাঠামো) সাথে পরিচিত। চতুর্ভুজ আকৃতির গাঢ় নীল রঙের প্যানেলটির সাহায্যে নাকি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায় (!) অনেকে নিশ্চয় অবাক হয়ে যান এই ভেবে যে, কিভাবে হয় এই বিদ্যুৎ উৎপাদন আর কিভাবেই বা কাজ করে এটি ?

কৌতুহলী মনের এই স্বাভাবিক প্রশ্নের উত্তর জানাতেই আমার এই ছোট্ট প্রচেষ্টা আর উত্তর জানতে জানতে আমরা জানার চেষ্টা করব সোলার প্যানেলের গঠন ও এর কার্যকারিতা সম্পর্কে।

সোলার প্যানেল সম্পর্কে জানার আগে আমাদের জানা প্রয়োজন সোলার এনার্জি (Solar Energy) বা সৌর শক্তি সম্পর্কে। খুব সহজভাবে বলতে গেলে সৌরশক্তি হল সূর্য থেকে প্রাপ্ত শক্তি। আমরা সকলেই জানি যে, সূর্য হল সকল শক্তির আধার। প্রতিদিন আমাদের কাছে যে সূর্যের আলো পৌঁছায়, তা মূলত দুটো শক্তি বহন করে–(১) আলোক শক্তি এবং (২) তাপ শক্তি। ম্যাক্স প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম ম্যাকানিক্সের বিশ্লেষণ করে আমরা জানতে পারি, সূর্যের আলো আমাদের কাছে সরাসরি আসে না, বরংঞ্চ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যাকেট আকারে আসে। আর এই প্যাকেটগুলোকে বলা হয় 'ফোটন' আর এই ফোটনই হল সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের মূল উপাদান

এবার একটু গভীরে যাওয়া যাক। আমরা যে সোলার প্যানেল দেখি তা মূলত অনেকগুলো সুবিন্যাস্ত সোলার সেল (Solar Cell) বা সৌর কোষ দ্বারা তৈরি একটি কাঠামো। এই সৌর কোষগুলো সূর্যের আলোক শক্তিকে আলোক বিভব ক্রিয়ার (Photovoltaic Effect) মাধ্যমে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে। আর তাই এদেরকে সোলার ফটোভলটিয়েক সেলও বলা হয়। সৌর কোষগুলোকে সাধারণত সিরিজ এবং সমান্তরালভাবে মডিল বা প্যানেলে যুক্তকরা হয় সোলার সেল টেকনোলজি বা সৌরকোষ প্রযুক্তির সর্বপ্রথম সর্বজন গৃহীত ধারণা প্রদান করেন ফরাসি পদার্থবিদ এন্তনী বেকিউরেল (Antonee Becurel) ১৮৩৯ সালে বেকিউরেল যখন তার গবেষণাগারে ধাতব ইলেক্ট্রোড দিয়ে তড়িৎ বিশ্লেষণ করছিলেন, তখন তিনি দেখতে পান যে, ওই ইলেক্ট্রোডের ওপর সূর্যের আলোক-রশ্মি পড়লে তা এক ধরনের তড়িৎ বিভব ক্রিয়ার তৈরি করছে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটিনিকার তথ্যানুসারে প্রথম যথার্থ সৌরকোষ আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী চার্লস ফ্রিটস, ১৮৮৩ সালে। তবে বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত সিলিকন সোলার সেল তৈরি করেন বিজ্ঞানী রাসেল ওল ১৯৪১ সালে। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত বেল গবেষণাগারে তিনজন বিজ্ঞানী গিরাল্ড পিয়ারসন, কেলভিন ফুলার এবং ডারয়েল চ্যাপিন এমন একটি সোলার সেল আবিষ্কার করলেন যা সূর্য থেকে প্রাপ্ত আলোক শক্তিকে ছয় শতাংশ পর্যন্ত বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরে সক্ষম ছিল আর তাঁরাই সর্বপ্রথম সোলার প্যানেল আবিষ্কার করেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই সৌর কোষগুলো এমন কি দিয়ে তৈরি যে তা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারে ? প্রধানত, সৌর কোষ তৈরি হয় কোন অর্ধ-পরিবাহী বা Semi-Conductor দ্বারা যাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিলিকন ব্যবহৃত হয়। এই অর্ধ-পরিবাহীর দুটো স্তর থাকে, একটি হল এন-টাইপ (n-type) অন্যটি হল পি-টাইপ (p-type) এন-টাইপ সেমিকন্ডাক্টর হল ঋণাত্মক চার্জ বা ইলেক্ট্রন পরিবাহী আর পি-টাইপ সেমিকন্ডাক্টর হল ধনাত্মক চার্জ বা হোল পরিবাহী। সোলার সেল বা সৌরকোষ তৈরিতে এন-টাইপ সেমিকন্ডাক্টরকে উপরের দিকে এবং পি-টাইপ সেমিকন্ডাক্টরকে নিচের দিকে রাখা হয় যখন সূর্যের আলো

এন-টাইপ সেমিকন্ডাক্টরের ওপর আপাতিত হয় তখন ফোটনগুলো কিছু ইলেক্ট্রন সরিয়ে তাদের জায়গা দখল করে নেয়। ফলে বেশকিছু ইলেক্ট্রন মুক্ত ইলেক্ট্রনে পরিণত হয়। একটি বাহ্যিক পরিবাহী বা তার দ্বারা এন-টাইপ ও পি-টাইপ সেমিকন্ডাকটর পরস্পর সংযুক্ত থাকে। ফলে মুক্ত ইলেক্ট্রনগুলো হোল বা পজিটিভ চার্জবাহী পি-টাইপের দিকে ধাবিত হয়। এভাবে তাদের মধ্যে একটি তড়িৎ বিভবের সৃষ্টি হয় এবং তারের মধ্য দিয়ে ইলেক্ট্রন প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

এভাবে অসংখ্য সোলার সেলকে পরস্পরের সাথে সিরিজে সংযুক্ত করে একেকটি সোলার মডিউল বা সোলার প্যানেল তৈরি করা হয়। বৃষ্টি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সোলার প্যানেলের ওপর একটি সচ্চ কাচ বসানো থাকে। সমস্ত কাঠামোটিকে সাবধানে বৈদ্যুতিক ওয়েল্ডিং এর মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়। এখন সোলার প্যানেলের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে কোন লোড, যেমন–বৈদ্যুতিক বাতি সংযোগ করে দিলে এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে এবং বাতিটি জ্বলে ওঠবে। তবে মনে রাখতে হবে বাতিটি ঠিক ততোক্ষণ পর্যন্ত জ্বলবে যতক্ষণ পর্যন্ত এর ওপর সূর্যের আলো আপাতিত হবে। তাহলে সোলার প্যানেল থেকে রাতের বেলা কিভাবে বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে ? খুব সহজ, যদি এক বা একাধিক সোলার প্যানেলকে সিরিজে সংযুক্ত করে একটি ডি.সি. ব্যাটারির সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয় তবে ওই ব্যাটারিটি তার ক্ষমতানুযায়ী বিদ্যুৎ সংরক্ষণ করবে এবং পরবর্তীতেদ প্রয়োজন অনুসারে তা থেকে লোডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাবে বা প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। এমনকি ইনভার্টারের সাহায্যে এই বিদ্যুৎকে এ.সি. (অল্টার্নেটিং কারেন্ট বা AC) তে রূপান্তরিত করে মূল বিদ্যুৎ লাইনেও সরবরাহ করা যাবে।

বর্তমান বিশ্বে জীবাশ্ম জ্বালানির প্রকট ব্যবহার ও এর অপ্রতুলতার কথা চিন্তা করে অধিকাংশ দেশে হতাজার হাজার সোলার প্যানেল বসিয়ে বড় বড় বৈদ্যুতিক পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ করা হচ্ছে। তাছাড়া, পরিবেশ বিপর্যয়ের এই যুগে সৌর বিদ্যুৎ হল সবচেয়ে পরিবেশ বান্ধব। সোলার প্যানেল কোন ধরনের জ্বালানি পোড়ায় না। যার ফলে এর থেকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এমন কোনকিছুই উৎপন্ন হয় না। এ ছাড়াও সোলার প্যানেল ঘূর্ণনশীল কোন অংশ না থাকায় এটিকে বলা হয় মেইনটেন্যান্স ফ্রি (Maintanance Free)। সোলার প্যানেলের সর্বাত্মক ব্যবহারই পাবে আগামী পৃথিবীকে আরো সবুজময় করে গড়ে তুলতে।

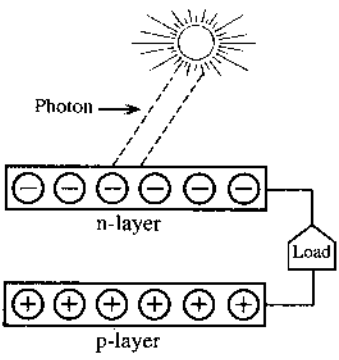

Basic Electricity Production বা মূল সৌরকোষের বিদ্যুৎ উৎপাদনের চিত্র

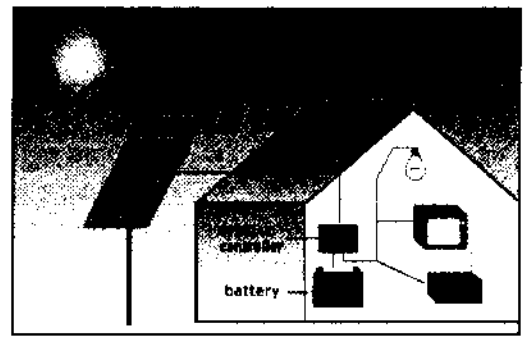

লেখক পরিচিতি : শিক্ষার্থী, তড়িৎ ও ইলেক্ট্রনিক্স প্রকৌশল বিভাগ, চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

থ্রিজি প্রযুক্তি নিয়ে বাংলাদেশ

– মোঃ মিজানুর রহমান

আমরা যখন হাইস্কুলে পড়তাম, তখন বাঙলা স্যার আমাদের বাগ্‌ধারা পড়াতেন। বাগ্‌ধারা পড়তে মজাই লাগে, কিন্তু মুখস্তের সময় কোন অংশই সহজ ছিল না। তাই বাংলা স্যারকে স্বভাবতই যেন কোন এক 'বাঘধরা' মনে হত। কিন্তু স্যারের অগ্নিশর্মা চোখের দিকে তাকাতে বড়ই ভালো লাগে। স্যার যখন পড়া ধরতে আসেন, তখন কিছু না কিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলি আমরা। স্যার তখন ইতস্তত বোধ করে দু'চারটে গালমন্দ করতে করতে বলতেন, "ভূষণ্ডির কাক, তোমাদের মত এমন ইচড়ে পাকা ছেলে আমি বাপের জন্মে দেখিনি"। কখনও বা কয়েকটা উত্তম মধ্যমও দিতেন। তারপর ফের পড়াতেন। অবশ্য সেদিন আর নূতন করে কিছুই পড়ান নি। সেদিনের বিষয় ছিল-কূপমণ্ডুক-অর্থ কুয়োর ব্যাঙ, ঘরকুনো। সেদিনের সেই ছন্দে ছন্দে তাল মিলিয়ে পড়া বাগ্‌ধারা আজও কানে বাজে। স্যার আমাদের গল্পের মধ্য দিয়ে বোঝাতেন। মনে কর দু'টো ব্যাঙ-একটি খোলা জলাশয়ের, অন্যটি কূয়োর তলার। কালের আবর্তে একদিন দু-বন্ধুর মধ্যে দেখা হয়। কথার মধ্যে মুক্ত জলাশয়ের ব্যাঙ কূয়োর ব্যাঙটিকে বলে, "আমি চলতে চলতে জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু এ পৃথিবীটা সম্পূর্ণ ঘুরে আসতে পারলাম না। পৃথিবীটা এত বড়!" মুক্ত জলাশয়ের ব্যাঙটির কথা শুনে কূয়োর ব্যাঙটি চোখ কপালে তুলে বলে, "তোমার মাথা ঠিক আছে তো; এত ছোট পৃথিবী তো আমি আর কোথাও দেখিনি। আমি তো ঘন্টায় আঠার বার গোটা পৃথিবী ঘুরে আসছি। এত ছোট পৃথিবীতে কেউ বাস করে..."

এ তো গেল শুধু বাগ্‌ধারার কথা। আরও কথা আছে। আর তাই বাগ্‌ধারা পড়ার দিনগুলো আর আজকের তথ্য প্রযুক্তির দিনগুলো নিয়ে বেশ দ্বিধায় আছি। বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ-কথাটা শুধু এভাবেই বললে বোধ হয় শুধুই কার্পন্যতা প্রকাশ পাবে। কিন্তু কথার স্বার্থকতা দেয়ার জন্য আর কেমন শব্দ ব্যবহার করতে হবে-তা ভেবে পাই না। আজকের দিনে মোবাইলে বা ইন্টারনেটে যে ব্যক্তিটির সাথে কথা বলবেন; শুধু এতেই শেষ নয়, বরং কথা বলার সাথে সাথে আপনি ঐ ব্যক্তিটিকে দেখতেও পাবেন-কথাটা যেন কেমন একটা কাল্পনিক গল্পের মতো মনে হয়। অবাক করা কথা হলেও আমাদের এটাই মানতে হবে যে, একবিংশ শতাব্দী সাধন করার গৌরব অর্জন করেছে। এই থ্রিজি ব্যবহার করে আমরা যখন গোটা পৃথিবীর খোঁজ খবর রাখতে পারি; পুরো বিশ্বকে পকেটে নিয়ে ঘুরতে পারি, তখন তো আমাদের ঘরকুনো নামটাই বেছে নেয়া শ্রেয়! অবশ্য এ কথাও ঠিক যে, আজকের দিনে মানুষ কূয়োর ব্যাঙের সাথে মিত্রতা পাকালেও একদিন মুক্ত জলাশয়ের ব্যাঙের মতো গোটা বিশ্বকে জানতে হাতড়ে মরেছে।

সে অনেক আগের কথা। মোবাইল ফোনের যখন জন্মই হয় নি। সংবাদ আদান-প্রদান তখন কতই না কঠিন কাজ ছিল। একদিকে যেমন অনেক অর্থ ও সময় লাগত, অন্যদিকে তেমনি মানুষের কষ্টেরও সীমা ছাড়িয়ে যেত। তারপর বিজ্ঞানের বহু চড়াই উৎরাই পার হয়ে ১৮৭৭ সালে আবিষ্কার করা হল টেলিফোন। আমেরিকার বিজ্ঞানী গ্রাহাম বেল তার দুই সহযোগী রিচার্ড এইচ. ফ্রাংকিয়েল ও জোয়েল এস. এঞ্জেল এ কাজ সম্পন্ন করেছিলেন।

বিজ্ঞানের এই আশির্বাদটি মানুষের কষ্ট কিছুটা লাঘব করলেও টেলিফোনের কিছুটা অসুবিধাও ছিল। প্রথম পর্যায়ে সীমিত আকারে মোবাইল ফোন তথা টেলিফোনের ব্যবহার শুরু হয়েছিল সেন্ট লুইচ শহরে ১৯৪৭ সালে। ১৯৬৪ সালের দিকে শুধু গাড়িতে মোবাইল ফোন বসানো থাকত। ধীরে ধীরে ১৯৭১ সালে

ফিনল্যাণ্ডে সকল মানুষের জন্য মোবাইল ফোনের ব্যবহার শুরু হয়। কিন্তু তারপরেও টেলিফোন নিয়ে মানুষের মধ্যে অস্বস্তি রয়েই গেল। প্রথমত এটি ছিল আয়তনে খুব বড় এবং ওজনে যথেষ্ঠ ভারী। তাছাড়া যন্ত্রটির এক প্রান্ত বৈদ্যুতিক তার দিয়ে সংযোগ লাগানো বলে টেলিফোনকে যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে যাওয়া প্রায়ই অসম্ভব ছিল। তারপর এটি শুধুমাত্র কথা বলা আর শোনার এক বুদ্ধিহীন যন্ত্র।

তারপর কিছুকাল এভাবেই কেটে গেল। মোবাইল ফোন নিয়ে অনেক গবেষণা চলতে থাকল। অতঃপর ১৯৭৩ সালে সর্বপ্রথম মার্টিন কুপার তারবিহীন মোবাইল ফোন আবিষ্কারের কৃতিত্ব অর্জন করেন এবং তার আবিষ্কারকৃত মোবাইল ফোনটির ওজন ছিল প্রায় এক কেজি। তিনি এর প্রথম উদ্ভাবক কোয়েল এস. এঞ্জেলকে পরীক্ষামূলক প্রথম কলটি করেন। তার আবিস্কৃত এই ফোন দিয়ে যে খুব বেশি সময় কথা বলা যেত তা কিন্তু নয়। তিনি অনুমান করেছিলেন যে মোবাইল ফোন একদিন পৃথিবীর চেহারাটাই বদলে দেবে। বাস্তবিক পক্ষে তাই ঘটেছে। মোবাইল ফোন আজ যে শুধু পৃথিবীর চেহারাই বদলে ফেলেছে তা কিন্তু নয়, বরং আজকের দিনে এ পৃথিবীটা বড় নাকি তৃতীয় প্রজন্মের এই থ্রিজি ফোনটা বড় তা নিয়ে কথা উঠেছে। বিনা দ্বিধায় আজ বলা যায় যে, থ্রিজি মোবাইল আজ কম্পিউটারকেও ছাড়িয়ে গেছে। আকারে ছোট হলেও এ যেন আস্ত একটা কম্পিউটার। দিন যতই অতিবাহিত হচ্ছে, মোবাইল ফোনের উৎকর্ষতাও তত বেড়েই চলেছে। আজকের মোবাইল ফোন দিয়ে শুধু কথা বলা আর শোনা যায় তাই নয়, বরং কথা বলা আর শোনা ছাড়াও একাধারে গান শোনা, ছবি তোলা এবং ছবি দেখা যায়। আজকের মোবাইল ফোন অনায়াসেই ঘড়ি, ক্যালকুলেটরের মতো যন্ত্রের কাজও করে দিচ্ছে। ইন্টারনেটে ঢুকে আমরা নিমিষের মধ্যেই বিলিয়ন বিলিয়ন তথ্য হাতের কাছে পেয়ে যাচ্ছি। গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্যের জন্য আর কষ্ট করে সময় অপচয় করে বই ঘাটতে হয় না। উচ্চ শিক্ষার ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার অনেক বইয়ের মূল্যই আমাদের হাতের নাগালের বাইরে। অথচ সামান্য কিছু মেগাবাইটের বিনিময়ে কম্পিউটারের সামনে বসে মাউস দিয়ে কয়েকটা ক্লিক করলেই আমাদের সামনে মনিটরের পর্দায় ভেসে আসে মূল্যবান বইয়ের সব তথ্য। তাছাড়া ফেইস বুক এবং টুইটার থেকে আমরা মুহূর্তের মধ্যে আমাদের বন্ধু ও গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সাথে ভাবের আদান-প্রদান করতে পারি। নতুন আঙ্গিকে বন্ধুত্ব করা এবং তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার এক অভাবনীয় সাফল্য নিয়ে এসেছে এই ফেইস বুক এবং টুইটার।

'প্রথম জি' প্রজন্মের মোবাইল নেটওয়ার্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে ১৯৭৯ সালে জাপানে শুরু হয়েছিল নাগরিকের দুই প্রান্তের তারবিহীন টেলি যোগাযোগের প্রথম যাত্রা। এটি ছিল এনালগ মোবাইল ফোন। এরপর ১৯৯১ সালে 'টুজি' বা প্রথম ডিজিটাল মোবাইল নেটওয়ার্ক ফিনল্যাণ্ডে যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশে আমরা মূলত প্রথম 'টুজি' মোবাইল নেটওয়ার্ক স্থাপনের অনুমোদন পেয়েছিলাম ১৯৯৭ সালে। আর বিশ্বের প্রথম কমার্শিয়াল 'থ্রিজি' নেটওয়ার্ক চালু হয়েছিল ১ অক্টোবর ২০০১ সালে জাপানে। যা পরবর্তী দুই-তিন বছরের মধ্যেই বিশ্বের ধনী দেশগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এক এক দেশ তাদের মোবাইল অপারেটরদের নেটওয়ার্ক সার্ভিস 'থ্রিজি'তে আপডেট করার জন্য চাপ দিতে থাকে। আবার কোথাও কোথাও বিনামূল্যে তরঙ্গ পর্যন্তও বরাদ্দ দিয়ে দেয়া হয়। নেটওয়ার্ক সম্পন্ন করার জন্য সময় বেঁধে দিয়ে তারা বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে। কেননা, তারা জানত যেখানে ব্রডব্যান্ডের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে অপটিক কেবলে স্থির লোকেশনে সংযোগ নিতে হয়, তা হাতের মোবাইলে বাতাসের ভিতর দিয়ে ভারচুয়্যাল স্বাধীনতার দরজা বিশ শতকের অন্যতম আবিষ্কার বলে গন্য করা হয়। কেননা, তখন আর সবার বুঝতে বাকী থাকে না যে, এই ইউনিভারসার ব্রডব্যান্ডেই নাগরিক ও রাষ্ট্রকে অনলাইনে একসূত্রে গেঁথে দিয়ে সর্বাধিক সুবিধা যেমনঃ স্বচ্ছতা, নিরাপত্তা, প্রশাসন, বিনোদন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ অসংখ্য আশির্বাদ ঘরে ঘরে নাগরিকের পকেটে পকেটে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে। উল্লেখ্য, তৃতীয় প্রজন্মের ফোন বা 'থ্রিজি' চালু

করার পর ডেনমার্কে এক হিসাব চালিয়ে দেখা গেছে যে, মাত্র ছয় মাসে রাজধানীতে তাদের রোড ট্রাফিক ২৫% কমে গেছে অনুসন্ধানে আরও দেখা যায়, মানুষের কাজের জন্য যে মোবালাইজেশন তার অনেক কিছুতেই ইকোনোমিক এক্টিভিটি এলাউড মুভমেন্ট সুবিধা মানুষ তার প্রয়োজনীয় অসংখ্য কাজ মলিটিউল মোবালাইজেশনের পরিবর্তে রিড মোবালাইজেশনে আরও সহজে ব্যয় করতে দিয়েছে। অন্যদিকে ২০০৬-০৭ সালের দিকে এসে সেসব দেশে যেসব 'থ্রিজি' নেটওয়ার্ক আরও আপডেট করে বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন তিন দশমিক পাঁচ (৩.৫) জি ইউনিভার্সাল মোবাইল টেলিকমুনিকেশন সিস্টেম বা UMTS, হাই স্পীড ডাউনলিং প্যাকেজ এক্সেস বা HSDPA ইত্যাদিতে উন্নীত হয়েছে। আজ চোখ বন্ধ করে এ কথা বলা যায় যে, তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল বা 'থ্রিজি'র দুনিয়ায় বাংলাদেশের প্রবেশ গতিহীনতার অবসান ঘটাবে। 'থ্রিজি' মডেম ব্যবহার করে ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট কম্পিউটারেও পাওয়া যাবে দুরন্ত গতির ইন্টারনেট এর মধ্যে ইন্টারনেট ভিত্তিক সেবা যেমনঃ ই-মেইল, নেট ব্রাউজিং, ভিডিও কল, ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, ই-গর্ভনমেন্ট ইত্যাদি সাধারণ মানুষের দোরগড়ায় নিয়ে যাওয়া যাবে খুব সহজেই।

যেহেতু থ্রিজি মোবাইলে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ব্যক্তিটিকে একসাথে দেখা ও কথা বলা যাবে, সেহেতু ঘরে বসেই এ ফোনের মাধ্যমে শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা ইত্যাদি যোগাযোগ খুব সহজে রক্ষা করা যাবে। তাছাড়া নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা এ ফোনের মাধ্যমে খুব সহজে প্রকৃত অপরাধিকে শনাক্ত করতে পারবে। তবে বিজ্ঞানের একদিকে যেমন উপকারিতা আছে ঠিক অপকারিতাও রয়েছে। থ্রিজি মোবাইল এর বিপরীত কিছু নয়। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে অপরাধের আশঙ্কা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পর্ণো ছবির বিপণন বেড়ে যাওয়ার শঙ্কাও যথেষ্ট রয়েছে। যার দরুণ এ দেশের তরুণদের এতে আসক্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। সর্বোপরি এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, 'থ্রিজি'র খারাপ দিকগুলো নয়; বরং এর ভাল দিকগুলো ব্যবহার করে এবং মানুষের মধ্যে ন্যায়-নীতিবোধ ও মূল্যবোধ বৃদ্ধি করে এর উৎকর্ষতা সাধন করতে পারলে আমরা আমাদের স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশকে একদিন বাস্তবে পরিণত করব - এ কথা অনস্বীকার্য।

লেখক পরিচিতি : সাধারণ সম্পাদক, আফাজ উদ্দিন স্মৃতি বিজ্ঞান ক্লাব, পার্বতীপুর, দিনাজপুর

স্পাইডার সিল্ক

– মোরছালিনা ইসলাম (কথা)

স্পাইডার সিল্ক ?!!! শুনতেই অবাক লাগে। মাকড়সার মতো ছোট এই কীটটির দ্বারা কিভাবে সিল্ক তৈরী করা সম্ভব ?!!! অবাক হলেও এটি সত্য।

স্পাইডার সিল্ক

বর্তমানে আমরা বসবাস করছি আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির যুগে। দিন দিন উন্মোচন হচ্ছে নানা রহস্যের জাল। বিজ্ঞানের হাত পৌঁছায়নি এরূপ জায়গা খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দিন দিন উন্নতির পথে এগিয়ে চলছে। স্পাইডার সিল্ক এরূপ এক বিস্ময়কর আবিষ্কার, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজির প্রাঙ্গণে। টেক্সটাইল বিজ্ঞান সংগঠন অবিরাম কাজ করে যাছে এরূপ নতুন নতুন ডিজাইন এবং নতুন নতুন তন্তু আবিষ্কারের ক্ষেত্রে।

স্পাইডার সিল্ক হল মাকড়সা দ্বারা প্রোটিন তন্তু। মাকড়সা সিল্ক ব্যবহার করে থাকে Web তৈরীতে, যা জাল হিসেবে কাজ করে থাকে পোকামাকড় ধরতে, বাসা তৈরীতে অথবা গুটি তাদের সন্তানসন্ততি রক্ষা করতে। মাকড়সা নিজেদের লুকিয়ে রাখার জন্য সিল্ক ব্যবহার করে থাকে।

স্পাইডার সিল্ক দ্বারা তৈরী পোশাক

অনেক ছোট ছোট মাকড়সা সিল্ক ব্যবহার করে থাকে বেলুনিং এর জন্য। অনেক সূক্ষ্ম সিল্ক যা বেলুনিং এর জন্য ব্যবহৃত হয় তা Gossamer হিসেবে পরিচিত। মাকড়সা খাদ্যে উৎস হিসেবে সিল্ক ব্যবহার করে থাকে। বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে মাকড়সা হতে জোড়পূর্বক সিল্ক সংগ্রহ করার জন্য।

ব্যবহার : মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে স্পাইডার সিল্ক ব্যবহার করে যাচ্ছে। প্রাচীন গ্রীকে শরীরের কোথাও কেটে গেলে রক্তপাত বন্ধ করার জন্য মাকড়সার জাল ব্যবহার করত। আদিবাসীরা ছোট মাছ ধরার জন্য লাইন হিসেবে সিল্ক ব্যবহার করত। সম্প্রতিকালে সিল্ক ব্যবহার হয় Crossbairs অপটিক্যাল লক্ষ্য ডিভাইস হিসেবে যেমন-বন্দুক এবং টেলিস্কোপ হিসেবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। সোলায়মান দ্বীপের মানুষ এখনও মাছ ধরার জাল হিসেবে সিল্ক ব্যবহার করে থাকে।

স্পাইডার সিল্ক নিয়ে গবেষণা বর্তমানে একটি অবিশ্বাস্যভাবে শক্তিশালী এবং বহুমুখী উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং অদূষণীয় উপায় স্বরূপ স্পাইডার সিল্ক ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন-Kevlar আধুনিক মানুষ সৃষ্ট সুপার তন্তু যা সম্পূর্ণভাবে পরিবেশ বান্ধব। বিভিন্ন পরিসরে স্পাইডার সিল্ক এর ব্যবহার -

- বুলেট প্রুফ পোষাক;
- দড়ি, জাল, সিট বেল্ট, প্যারাসুট;

- মোটর গাড়ি বা নৌকার উপর মরিচা প্রতিরোধক;
- জীবাণু বিয়োজ্য বোতল;
- ব্যাণ্ডেজ, অস্ত্রোপাচার থ্রেড;
- কৃত্রিম tendons বা লিগামেন্ট, দুর্বল রক্তনালীসমূহ সমর্থন করতে;
- বেলুনিং বা Knitting করার জন্য অনেক ছোট মাকড়সা ব্যবহার করা হয়;
- গাইডলাইন হিসেবে কিছু মাকড়সা যথা-Venture, আশ্রয়স্থল থেকে যাওয়ার পূর্বে লেজ ছেড়ে চলে যায় বা গুটি ফেলে যায়, এতে করে পরবর্তীতে বাসা খুঁজার উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বুলেট প্রুফ পোশাক

ধরণ ঃ মাকড়সার বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে সিল্ক ব্যবহার করা যায়। তা হলো :-

গ্রন্থি	সিল্ক ব্যবহার
Ampullate (মেজর)	Dragline সিল্ক ব্যবহৃত হয় ওয়েব এর বাইরের রিম এবং লাইফলাইন এর জন্য।
Ampullate (ক্ষুদ্র)	ওয়েব নির্মাণের সময় অস্থায়ী খুঁটির জন্য ব্যবহৃত হয়।
Flagelliforos	ক্যাপচার-স্পাইডার সিল্ক ওয়েব এর ক্যাপচার লাইন হিসেবে ব্যবহৃত হয়
Tubuliform	ডিম গুটি সিল্ক ব্যবহৃত হয় প্রতিরক্ষামূলক ডিম থলির জন্য।
Aciniform	শিকারকে বন্দী করে মোড়ানোর জন্য পুরুষের শুক্রাণু ওয়েবে ব্যবহৃত হয়।
সমষ্টি	চটচটে তেলে ফোঁটা একটি সিল্ক আঠালো হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

স্পাইডার সিল্ক দ্বারা কিছু অভূতপূর্ব জিনিস আবিষ্কার চলছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো Heart (হৃদয়)। ইঞ্জিনিয়ারিং প্রক্রিয়ায় তৈরী হয় Spidron তন্তু। দিন দিন বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে কৃত্রিম হার্ট তৈরী করার জন্য যা স্পাইডার জাল দ্বারা সেলাই করা থাকবে। শুনতেই অবাক লাগছে, এই স্পাইডার তন্তু পাঁচ গুণ বেশী শক্তিশালী ইস্পাত হতে এবং দ্বিগুণ বেশী স্থিতিস্থাপক নাইলন হতে।

স্পাইডার সিল্ক ফাইবার অপটিক তারের জন্য জীবাণু বিয়োজ্য বিকল্প হিসেবে প্রযুক্তিতে ব্যবহার চলছে আলো সহজে ফাইবার অপটিক তারের Silk Strand এর মাধ্যমে সহজেই স্থানান্তর করতে পারে। ফ্রান্সের Institute de physigue de Rennes পরীক্ষা করেছে, কম্পিউটার চিপের উপর সিল্ক Strand রেখে আলো এর নিচে ফেলা হলে সিল্ক সফলভাবেই তথ্য Ferrying করে, যদিও চারগুণ বেশী ক্ষতি হয়ে থাকে

কাচ হতে। কিন্তু টিম অধিনায়ক Nolween মনে করেন, এদের ক্ষমতা আরো উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারে।

কিছু তথ্য ঃ

- স্পাইডার সিল্ক অপটিক্যাল যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা-টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ ইত্যাদি।
- ২০১১ সালে স্পাইডার তন্তু খুব ছোট অপবর্তন নিদর্শন তৈরী করতে অপটিক্স ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল।
- ২০১২ সালে স্পাইডার সিল্ক তন্তু বেহালার স্ট্রিং একটি সেট তৈরী করতে ব্যবহার করা হয়।

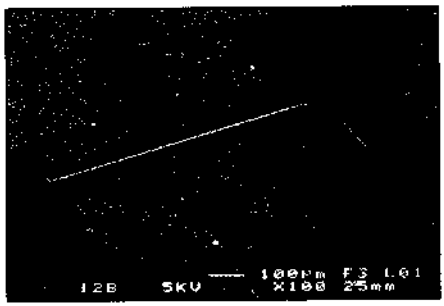

আলো ধরে রাখতে পারে যে তিনটি ডিস্ক সংযোগ, Photonic চিপ এর মাধ্যমে একত্রিত একটি সিল্ক ফাইবার

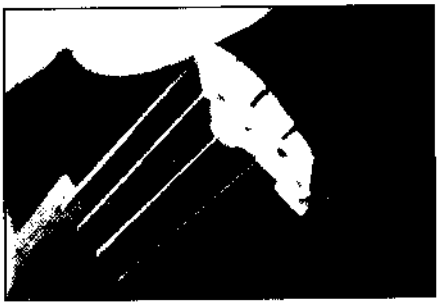

স্পাইডার সিল্ক দ্বারা তৈরী বেহালার স্ট্রিং

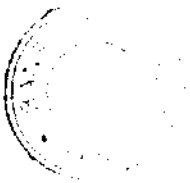

লেখক পরিচিতি : শিক্ষার্থী, ৩য় বর্ষ, ২য় সেমিস্টার, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল

আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময় কম্পিউটার

– কামরুন নাহার

বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এসে বিজ্ঞান মানব সভ্যতাকে একটি অত্যন্ত উঁচু শিখরে নিয়ে এসেছে। নানারকম আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সাহায্যে বিজ্ঞানের সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আর যন্ত্রপ্রকৌশল ও প্রযুক্তি নির্ভর মানব সভ্যতার অগণিত আবিষ্কারের বিস্ময়ের ঘোর না কাটতেই বিশ শতকে যে মহাবিস্ময়কে মানুষ আলাদিনের চিরাগের মতো হাতের মুঠোয় পেয়েছি তার নাম কম্পিউটার। কম্পিউটার দ্বারা মানুষ নানা ধরনের কাজ করতে সক্ষম। কম্পিউটারের শাব্দিক অর্থ হিসাবকারী যন্ত্র। তবে কেবল যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতির ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ নয়। এ এক পরাক্রমশালী অথচ অনুগত যন্ত্র যা মানুষের কর্মজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অবলীলায় অক্ষরে অক্ষরে প্রতিটি হুকুম পালন করে। বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে নিতান্ত সাধারণ মানুষের জীবনে আজ কম্পিউটার একটি প্রয়োজনীয় জিনিসে পরিণত হয়েছে।

'কম্পিউটার' আমাদের কাছে একটি নতুন আবিষ্কার হলেও কিন্তু এর পিছনে বহুকালের বহুজনের অবদান রয়েছে। যোগ-বিয়োগ করতে পারে এমন একটি গণকযন্ত্র প্রথম আবিষ্কার করেন ব্লেইলি প্যাসকেল ১৬৪২ সালে। ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দে গণ ফ্রাইড গুণ ও ভাগ করতে পারে এমন যন্ত্র তৈরি করেন। কিন্তু গণিতজ্ঞ চার্লস ব্যাবেজই হলেন আধুনিক কম্পিউটারের জনক। তিনিই সর্বপ্রথম পাঁচটি অংশে সম্পূর্ণ আধুনিক কম্পিউটারের গঠনতত্ত্বের আবিষ্কারক। ব্যাবেজ কম্পিউটার তৈরি করেছিলেন ধাতব যন্ত্রাংশ দিয়ে। তখনো সূক্ষ্ম নানা যন্ত্রাংশ তৈরি না হওয়ায় তিনি আধুনিক কম্পিউটারের পরিপূর্ণ রূপ দিতে পারেন নি। তবে আজ আমরা যে কম্পিউটার ব্যবহার করছি তা ব্যাবেজের গঠনতত্ত্ব অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে। চার্লস ব্যাবেজের গঠনতত্ত্বে পাঁচটি অংশ রয়েছে যথা–(১) স্টোর (২) মিল (৩) কন্ট্রোল (৪) ইনপুট (৫) আউটপুট। অবশেষে ১৯৪৪ সালে বিশ্ববিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও আই.বি.এম কোম্পানীর যৌথ উদ্যোগে ইলেক্ট্রো মেকানিক্যাল কম্পিউটার তৈরি করে। তবে প্রথম পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার ইয়নিক ১৯৪৪ সালে তৈরি হয়।

কম্পিউটার আসলে এক ধরনের যন্ত্র মস্তিষ্ক। কম্পিউটার যে যাবতীয় তথ্য নিয়ে কাজ করে তাকে বলে 'প্রোগ্রাম'। কম্পিউটারের তথ্য ও নির্দেশ প্রদানের জন্য যে বিশেষ ভাষা ব্যবহার করা হয় তাকে বলে 'প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ'। একটি কম্পিউটারের অনেক যন্ত্রাংশ থাকলেও এর গঠনরীতির প্রধান দু'টি দিক লক্ষ্য করা যায়। একটি হলো যান্ত্রিক সরঞ্জাম বা হার্ডওয়্যার, অন্যটি প্রোগ্রাম সম্পর্কিত বা সফটওয়্যার। হার্ডওয়্যারের মধ্যে পড়ে তথ্য সংরক্ষণের স্মৃতি, ইনপুট অংশে তথ্য সংগ্রহের জন্য, ফলাফল প্রদর্শনের জন্য আউটপুট অংশ এবং সকল বৈদ্যুতিক বর্তনী। ডিজিটাল কম্পিউটার অনেকরকম কাজ করে। এনালগ কম্পিউটারের চেয়ে এর কাজ হাজার গুণে বেশী হিসাব তো করেই, অন্য যন্ত্রের ভুল ধরে তার সমাধার করতে এর জুড়ি নেই। কম্পিউটার বলতে এখন এই কম্পিউটারকেই বোঝানো হয়।

কম্পিউটারের এক ধরনের ভাষা আছে। অর্থাৎ বিশেষ কোন সাংকেতিক কথা সাজিয়ে মানুষ কি জানতে চায় প্রশ্নটি তাকে পাঠাতে হবে। এই ভাষাকে বলে প্রোগ্রাম। মনে করা যাক একটা মোটর গাড়ীর যন্ত্রের সমস্যা তাকে প্রোগ্রামের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হলো। এটা দিতে হবে তার গ্রহণযন্ত্রের মধ্যে। গ্রহণ যন্ত্র সেই প্রোগ্রামকে পাঠাবে সংরক্ষণ যন্ত্রে। সংরক্ষণ যন্ত্রে হাজার হাজার শব্দ ও অঙ্ক সাজানো হয়েছে। সেগুলো হলো তার স্মৃতি, মেধা বা বুদ্ধিও বলা যায়। সংরক্ষণ যন্ত্রের নির্দেশ কিভাবে পালন করতে হবে তা ঠিক করবে কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়া যন্ত্র। তার নির্গম যন্ত্র দিয়ে বেরিয়ে আসবে ফলাফল। কম্পিউটার এখন মানুষের অনেক কাজ করে দিতে পারে। যেমন–অনুবাদের কাজ। কম্পিউটার যে শুধু কবিতার বা সাহিত্যের

অনুবাদ করতে পারে তা নয়। একটি তথ্য বা খবর এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় ঠিকঠাক রূপান্তরিত করতে পারে। ১৯৬০ সাল থেকে কম্পিউটার রাশিয়ার প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকা 'প্রভাদা' এর গুরুত্বপূর্ণ সব খবরগুলো বোধগম্য ইংরেজীতে অনুবাদ করে আসছে। রাশিয়া এ ক্ষেত্রে এত উন্নতি করেছে যে, এ দেশের অনেক কারখানায় অনেক কাজ কম্পিউটার দ্বারা হয়ে থাকে। এদের বড় একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ১৯৪০ সালে ২৯০ জন প্রকৌশলী ছিলেন, এখন সেখানে কাজ করে মাত্র ৬ জন। বাকী কাজ করে যন্ত্র, মানে কম্পিউটার। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বড় বড় কৃষিখামারে কম্পিউটারের প্রচলন রয়েছে। কৃষকেরা দূরে ঘরে বসে কেবল সুইচ টিপে ট্রাক্টর চালান, বীজ বোনা, ফসল তোলা, মাড়ানো ইত্যাদির কাজ করেন। এমনকি ফসল গুদামে এনে কাচের বড় বড় বাক্সে ভরার কাজটিও কম্পিউটার করে। গরু-ছাগলকে খাবার খাওয়ানের জন্য কৃষকের কোন কাজ করতে হয় না। সুইচ টিপলে তাদের খাবার এসে হাজির হয়। কোন কোন কারখানায় অন্য যন্ত্রের ভুল ধরে একটি কম্পিউটার। ভুল সংশোধন করে আরেকটি কম্পিউটার।

সামগ্রিক তত্ত্বাবধানের জন্য উঁচু দরের কম্পিউটারও রয়েছে। জাপান, আমেরিকা ও ফ্রান্স উন্নয়নের ক্ষেত্রে দিন দিন উন্নততর প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে। জাপান এই প্রযুক্তির এক বিস্ময়কর সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। কম্পিউটার গণনাকারী যন্ত্র হিসেবে তৈরি হলেও আজকের দিনে সব কাজের উপযোগী হয়ে উঠেছে। দ্রুত ও নির্ভুল গণনা এবং তথ্য সংগ্রহ করে সঠিক হিসাবের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের অবদান অপরিসীম। যেসব কাজ মানুষের পক্ষে অসম্ভব, সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ কম্পিউটারের মাধ্যমে সেসব কাজ অনেক সহজ ও দ্রুততর হয়েছে। কম্পিউটার এখন রোগীর রোগ বলে দিতে পারে। চিকিৎসার পদ্ধতি সম্পর্কে দিতে পারে সঠিক দিক-নিদের্শনা। কোন প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কর্মীর মাসিক বেতন, আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ কম্পিউটারের সাহায্যে করা যায়। কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বহু বছরের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি নির্ভুলভাবে ও সুসংবদ্ধভাবে সংরক্ষণ করা যায়। কম্পিউটার যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে, প্লেনের বা ট্রেনের আসন সংরক্ষণ করে। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ব্যাপকভাবে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। কম্পিউটারের মাধ্যমে পরীক্ষার ফলাফল তৈরি এবং জমা রাখা হয়।

গবেষণা পরিচালনা, তথ্য উপস্থাপন ও সংরক্ষণে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া, বই ছাপার কাজে কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে দেশের লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীদের মাঝে সহজে বই বিতরণ করা সম্ভব হচ্ছে। 'ভাস্কর কম্পিউটার' নির্দেশ পেলে যেকোন জটিল ভাস্কর্য খোদাই করতে পারে। কম্পিউটারের মাধ্যমে আসামীকে চিহ্নিত করা যায়। আবার কম্পিউটারে দাবাসহ বিভিন্ন ধরনের খেলা রয়েছে যা আমাদের চিত্তবিনোদনের জন্য অন্যতম মাধ্যম। কম্পিউটারের বহুমুখী কার্যক্ষমতার কারণে তা পাকাপোক্তভাবে বসে গেছে কল-কারখানা, ব্যাঙ্ক, ইন্স্যুরেন্স, পোস্টাল সিস্টেম, রিসার্চ এণ্ড অ্যানালাইসিস, রেলওয়ে, এয়ারলাইন্স ইত্যাদি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলোতে। আর এভাবে ব্যবসায়-বাণিজ, চিকিৎসা, খেলাধুলা, শিল্পকারখানা, শিক্ষা, জনসংখ্যা, অর্থনৈকিতক, সামাজিক সর্বক্ষেত্রে কম্পিউটার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মানুষের মহাকাশ বিজয়ের কাজে সর্বাধিক সহায়ক শক্তি হল কম্পিউটার। কম্পিউটারের সাহায্যেই এ ক্ষেত্রে এতটা সাফল্য এসেছে।

আমাদের প্রায় সকল কাজই কম্পিউটার দ্বারা হয়ে থাকে। কম্পিউটার ছাড়া আমাদের জীবন অচল, কম্পিউটার আবিষ্কার এবং ব্যবহারে আধুনিক বিশ্ব তথা মানব সমাজে কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধ, বিগ্রহ, অস্ত্র নির্মাণ, আকাশ দখলের প্রতিযোগিতা প্রভৃতির পেছনে কম্পিউটারের অবদান রয়েছে। এ ছাড়া কম্পিউটারের মাধ্যমে সৃষ্ট ইন্টারনেট, ভিডিও গেম প্রভৃতির মাধ্যমে নানা কুরুচিপূর্ণ বিনোদন ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। কম্পিউটার অনেক সময় মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে তোলে। দীর্ঘসময় কম্পিউটারের সামনে বসে থাকা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এ ছাড়া কম্পিউটার যে পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে, ছিনিয়ে

নিয়েছে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি। আগে যেখানে দশজন লোক কাজ করতো সেখানে এখন একজন লোকই যথেষ্ট তাই কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে অনেক দেশেই বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, কানাডাসহ উন্নত দেশসমূহে দক্ষ কম্পিউটার প্রকৌশলীর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে আমেরিকায় সিলিকন ভ্যালিতে প্রচুর বাংলাদেশী সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সাফল্যের সাথে কাজ করছে। বাংলাদেশে কম্পিউটারের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হওয়ায় বিরাট বিদেশী বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। ইতমধ্যে বাংলাদেশে ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সফটওয়্যার রপ্তানি করেছে। বর্তমানে এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমান বিশ্বে কম্পিউটার একটি অগ্রগণ্য খাত।

বাংলাদেশও কম্পিউটারকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি স্কুল-কলেজে কম্পিউটার শিক্ষা বিভাগ খোলা হয়েছে। তাছাড়া উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিভাগ খোলাসহ আলাদাভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

কম্পিউটার বিস্তৃত কর্মকাণ্ড নিয়েই আজকের জগৎ। এর সফল প্রয়োগে আমরা অতি সহজেই কাঙ্খিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারি। শতাব্দীর এই বিস্ময়কর আবিষ্কারটিই সমস্যাসাঙ্কুল দেশের মানুষকে আঁধার থেকে আলোতে আনার পথ দেখাবে। আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্মকে কম্পিউটারের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারলে দেশে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। বিজ্ঞানের আশীর্বাদ থেকে মানুষ পিছিয়ে থাকতে পারে না। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আজ আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যায় প্রবেশ অপরিহার্য।

কম্পিউটারকে আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়. অনিবার্যভাবেই তার আগমণ ঘটে গেছে সারা দুনিয়ায়। সেক্ষেত্রে দেশের অবস্থাকে স্বীকার করেই প্রয়োগ ক্ষেত্র নির্বাচন করতে হবে. এর প্রয়োগের মধ্য দিয়েই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে নতুন কর্মসংস্থানের উপায়। শতাব্দীর এই বিস্ময়কর আবিষ্কারটিই আজ বলে দিবে কোন পথে আমাদের সার্থকতা, আর কোন পথে আমাদের অনগ্রসরতার কারণ সে দিনের অপেক্ষায়।

তাছাড়া, কম্পিউটার মানুষের বিচিত্র কর্মকান্ডে যে বৈপ্লবিক অগ্রগতি সাধন করছে তার সুফল অবশ্যই জাতির জন্য সম্প্রসারণ করতে হবে। বিশ্ব আজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। আমাদের অশিক্ষা, দারিদ্র, অনগ্রসরতা কাটিয়ে উঠে একবিংশ শতাব্দীতে সগৌরবে বরণ করে নেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার। কম্পিউটার সেই অগ্রযাত্রার সাথী হয়ে উঠলেই দেশ ও জাতির কল্যাণ।

কম্পিউটারের ব্যাপক উন্নয়ন না ঘটলে আজকের বিশ্বের চেহারাটি এরকম হতো না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিগত দুই-তিন শতকে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে কম্পিউটারের বিকাশ ছাড়া তার বেশির ভাগই সম্ভব হতো না। আজ মানুষ সিটি স্ক্যানের সাহায্যে রোগ নির্ণয় করছে, ইন্টারনেট ব্যবহার করছে।

মানুষ মঙ্গল গ্রহে গিয়ে বসবাসের স্বপ্ন দেখছে। এসব কিছুর মূলে কম্পিউটারের অবদান অপরিসীম। বিশ্বের যেকোন দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার অস্বীকার করার উপায় নেই. কম্পিউটারকে এক পাশে সরিয়ে রাখলে নিজেদেরই পিছিয়ে পড়তে হবে। প্রতিটি দেশের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কম্পিউটারকে যথার্থ ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে।

প্রায় তিন দশক আগে কম্পিউটার ব্যবহারের সূচনা ঘটলেও বাংলাদেশ কিন্তু প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারেনি। এর ফলে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমাদের দেশ উন্নত দেশগুলোর চেয়ে অনেক পিছনে পরে আছে। আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্মকে কম্পিউটার শিক্ষায় দক্ষ করে তুলে দেশের উন্নয়নে তাদের কাজে লাগানো সম্ভব। বিজ্ঞানের মহাবিস্ময়কর অবদান কম্পিউটার ছাড়া আমরা একদিনও চলতে পারবো না।

ঠিকানা : ৭৫ নং সুবলদাস রোড, লালবাগ, ঢাকা-১২০৫

তেজস্ক্রিয় মৌল পদার্থ

– কাজী রিচি ইসলাম

ফ্রান্সের বিজ্ঞানী হেনরী বেকেরেল ১৮৯৮ সালে পিচ ব্লেন্ড (একপ্রকার খনিজ পদার্থ) থেকে তেজস্ক্রিয় মৌল ইউরেনিয়াম আবিষ্কার করেন। এরপর এই পিচ ব্লেন্ড থেকেই পোল্যান্ডের বিজ্ঞানী মেরী কুরী ১৯০৩ সালে রেডিয়াম নামে আরেকটি তেজস্ক্রিয় মৌল আবিষ্কার করেন।

ইউরেনিয়াম দু'রকম খনিজ পদার্থ থেকে পাওয়া যায়। যথা–পিচ ব্লেন্ড ও কারনোটাইট। পিচ ব্লেন্ডের মধ্যে নানারকম মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। যেমন–টিন, সিলভার, কোবাল্ট, নিকেল, ইউরেনিয়াম। ইউরেনিয়াম পিচ ব্লেন্ডে ইউরেনিয়াম অক্সাইড হিসেবে আছে। আরেকটি মৌলিক পদার্থ আপনা থেকেই তেজ বিকিরণ করে। অর্থাৎ এদের এটম হতে নানারকম রশ্মি স্বত:স্ফূর্তভাবে অবিরাম নির্গত হয়। এই প্রক্রিয়াকে তেজস্ক্রিয়তা আর যে সমস্ত পদার্থ এ ধরনের রশ্মি ও কণা নির্গত করে তাদের বলা তেজস্ক্রিয় পদার্থ। যেমন–ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, রেডিয়াম ইত্যাদি।

কোন মৌলের পারমাণবিক ওজন বলতে এটমের ভেতর নিউক্লিয়াসে প্রোটিন ও নিউট্রনের সমষ্টির ওজনকে বোঝায়। এদিকে ইলেক্ট্রনের কোন ওজন নেই। বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করে রেডিওএকটিভ কী তা বের করেছেন।

এ পর্যন্ত ১০৯ টি মৌল আবিস্কৃত হয়েছে। এরমধ্যে প্রকৃতিতে পাওয়া গেছে ৯২ টি আর বাকী ১৭ টি বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরিতে উৎপন্ন করেছেন। সব মিলে ১০৯ টি যে মৌল পদার্থ রয়েছে তাদের এটমে এক থেকে ১০৯ টি প্রোটিন রয়েছে। ইলেক্ট্রনের হিসেবটা খুব সহজ। এটমের যতগুলো প্রোটন আছে, ঠিক ততগুলো ইলেকট্রনও থাকবে। হালকা মৌলিক পদার্থগুলোর নিউক্লিয়াসে প্রোটনের একই রকম সমধর্মী পজিটিভ চার্জের মধ্যে বিকর্ষণ বড় দুর্বল। ফলে নিউক্লিয়াস অটুট থাকে। একে স্থায়ী নিউক্লিয়াস বলে। ভারী মৌলিক পদার্থের (যাদের পারমাণবিক ওজন ২০৬-এর অধিক) নিউক্লিয়াস প্রোটনের সংখ্যা বেশি।

সমধর্মী পজিটিভ চার্জের বিকর্ষণ বল তুলনামূলক বেশি। সেই কারণে এটমের কেন্দ্র নিউক্লিয়াস ভেঙে নানারকম রশ্মি অবিরাম বের হয়ে আসছে। এদের অস্থায়ী নিউক্লিয়াস বলে। এ রশ্মি এটমের অংশ।

রশ্মিগুলো হল–আলফা রশ্মি, বিটা রশ্মি ও গামা রশ্মি। এদিকে তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো তেজ ছড়াতে ছড়াতে আপনা থেকে ক্ষয় হয়ে যায়। এভাবে ক্ষয় হতে হতে এমন একটা সময় আসে যখন এরা পুরো এনার্জি ছড়াতে পারে না। যখন এই এনার্জি ছড়ানো অর্ধেক হয়ে যায়, তখন এদের অর্ধজীবন শেষ হয়। বিজ্ঞানীরা এ অর্ধজীবনের হিসেব করেছেন। এক একটা তেজস্ক্রিয় পদার্থের এক একরকম অর্ধজীবন। যেমন–ইউরেনিয়ামের অর্ধজীবন ৪৫০ কোটি বছর, সোডিয়ামের ১,৫৬০, প্লুটোনিয়ামের ২৪,০০০ বছর, নেপচুনিয়ামের ২৩ মিনিট। এ থেকে বুঝা যায় ইউরেনিয়াম বেশি দীর্ঘস্থায়ী তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

তেজস্ক্রিয় ধর্মেও উৎপত্তিস্থল পরমাণু কেন্দ্র নিউক্লিয়াস। তেজস্ক্রিয় একটি স্বাভাবিক ও স্বত:স্ফূর্ত ঘটনা। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ, পজিটিভ চার্জযুক্ত কণার প্রবাহ, নেগেটিভ চার্জযুক্ত কণার প্রবাহ এবং বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের প্রবাহে সৃষ্ট তেজস্ক্রিয় দেহকোষে শোষিত হয়। জীবদেহের কোষের পক্ষে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ক্ষতিকর। আলফারশ্মি শরীরের কোন অংশে পড়লে বিকিরণ ক্ষত সৃষ্টি করে। মানবদেহে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ভয়াবহ। এতে থাইরয়েড, গ্ল্যান্ড, ফুসফুস, লিভার ও মূত্রথলি ক্যানসারে

আক্রান্ত হয়ে থাকে হাড়ের ভেতর অস্থিমজ্জায় তেজস্ক্রিয় বিকিরণে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকে। এর ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পায়।

পানি ও বাতাসের মাধ্যমে এরা দূরবর্তী অঞ্চলে ছড়াতে পারে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ পরিমাপের একক হল বেকেরেল বা বিকিউ এক বেকেরেল ওইটুকু তেজস্ক্রিয় পদার্থ যা থেকে প্রতি সেকেন্ডে একটি করে পরমাণু ভাঙ্গে এবং তেজস্ক্রিয় আলফা, বিটা গামা–এসব তেজস্ক্রিয় কণা নির্গত হয়। তেজস্ক্রিয়ার বেলায় বেকেরেল আর তেজস্ক্রিয়ার মাত্রার বেলায় রেম বা মিলিরেম একক হিসেবে ধরা হয় রেডিয়েশন ডিটেক্টর যন্ত্রের সাহায্যে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা নির্ণয় করা হয়। এই যন্ত্রটির সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে একটি মনিটরিং স্ক্রিন-টেলিভিশন পর্দা, কম্পিউটার ও প্রিন্টার। যেকোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ যন্ত্রের সামনে রাখলেই টেলিভিশনের পর্যায় ভেসে ওঠে পদার্থের বৈশিষ্ট ও পরিমাণ এবং তা প্রিন্টারে প্রিন্ট হয়ে যায়। এরপর কম্পিউটারে ডাটা বিশ্লেষণ করে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা জানিয়ে দেয়।

ঠিকানা : রোড নং-১৭, বাড়ী নং-৪ (৫ম তলা), রূপনগর আ/এ, মিরপুর, ঢাকা

অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান ঃ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

– মোঃ জিয়াউদ্দিন

জাদুঘর বলতে সাধারণত প্রাচীন জিনিসের সংগ্রহশালা বুঝে থাকি। কিন্তু গতানুগতিকভাবে জাদুঘর বলতে যা বুঝায় বিজ্ঞান জাদুঘর তা নয়। এটি মূলত একটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্র। সেই ষাটের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে "বিজ্ঞান আন্দোলন" নামে একটি আন্দোলন বেশ জোরালোভাবে শুরু হয়। যার উদ্দেশ্য ছিল যথোপযুক্ত প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটানো। এমনি ধরনের কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় ও যুগের দাবীর প্রেক্ষাপটে অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান চর্চার প্রবণতা ও প্রসারতা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর তার ব্যতিক্রম নয়. আমরা এখন লক্ষ্য করছি বিজ্ঞান কেন্দ্র ও বিজ্ঞান জাদুঘরসমূহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যাবতীয় তথ্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে এবং সহজ ও সরল ভাষায় জনসাধারণের কাছে তুলে ধরছে এবং একই সাথে এসবের জনপ্রিয়তাও ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে।

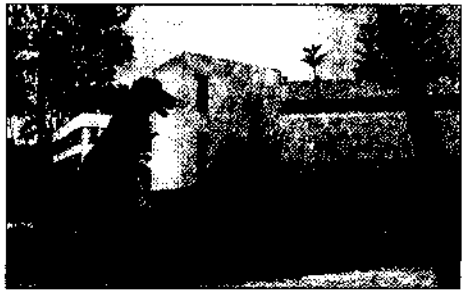

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ভবন

ঢাকায় অবস্থিত দেশের একমাত্র জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর একটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও প্রদর্শনীবস্তুর মাধ্যমে বিজ্ঞানকে অতিসহজে ছাত্র-ছাত্রী ও জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়া জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের একমাত্র উদ্দেশ্য। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর নিম্নরূপ উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

আকাশ পর্যবেক্ষণ

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০ অনুসারে জাদুঘরটির কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। জাদুঘর পরিচালনার জন্য ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড রয়েছে। মহাপরিচালক এই প্রতিষ্ঠানটির দপ্তর প্রধান।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০ অনুসারে জাদুঘরের কার্যাবলী :

- জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ও বিজ্ঞান সচেতনতা সৃষ্টি করা; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে –
- জাদুঘরে স্থায়ী বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা;
- বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান প্রদর্শনী এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক নানাবিধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা;

- বিভিন্ন জেলা শহরের পাবলিক লাইব্রেরী বা টাউন হল এবং শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে মিউজু বাসের মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক ডকুমেন্টারী প্রদর্শন, বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন প্রজেক্ট প্রদর্শনী, টেলিস্কোপের মাধ্যমে আকাশ পর্যবেক্ষণ এবং বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড এর ব্যবস্থা করা;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা করা;
- বক্তৃতামালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সম্মেলনের ব্যবস্থা করা;
- জাদুঘর এর উন্নয়নে প্রদর্শনী বস্তুসমূহের সাহায্যে গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করা;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপন এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যেকটি জেলায় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজন এবং প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে নবীন ও সৌখিন বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত প্রকল্পের মান উন্নয়নের জন্য কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করে উক্তরূপ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনীমূলক কাজে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা;

মিউজু বাসের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী

- দেশের বিজ্ঞান ক্লাবগুলোকে সাহায্য, সহযোগিতা ও উৎসাহ দান;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রাচীন ও আধুনিক নির্দশনাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও এর প্রায়োগিক ব্যবস্থা করা;
- বৎসরের বিশেষ দিনগুলোতে চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, ধুমকেতু, উল্কাপাত ইত্যাদি টেলিস্কোপের মাধ্যমে উন্মুক্ত পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ আবিষ্কার ও অবদানের জন্য স্বীকৃতি এবং পুরস্কার অথবা সম্মানী প্রদান করা; এবং
- উপরে বর্ণিত কার্যাদির সম্পূরক ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কার্য এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব সম্পাদন করা।

নিয়মিত কার্যক্রম : জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের বর্তমান কার্যক্রম মূলত ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন –

- গ্যালারী প্রদর্শনী;
- শিক্ষা কার্যক্রম; এবং
- প্রকাশনা।

এই তিনটি কার্যক্রমের আওতায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর নিম্নরূপ কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে ঃ

বিজ্ঞানভিত্তিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

- জাদুঘরে বর্তমানে ০৮টি প্রদর্শনী গ্যালারী আছে–(১) মঞ্জার বিজ্ঞান গ্যালারী, (২) চিলড্রেন গ্যালারী, (৩) ভৌত বিজ্ঞান গ্যালারী, (৪) শিল্প প্রযুক্তি গ্যালারী, (৫) জীব বিজ্ঞান গ্যালারী, (৬) তথ্য প্রযুক্তি গ্যালারী, (৭) মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারী ও (৮) তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত প্রকল্পের গ্যালারী।
- উল্লিখিত গ্যালারীগুলোতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন প্রদর্শনী বস্তু এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা

আবিষ্কার রয়েছে। এসব প্রদর্শনী বস্তু এবং আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও তথ্য জাদুঘরে আগত দর্শকদের মাঝে অভিজ্ঞ গাইডের মাধ্যমে তুলে ধরা এবং জাদুঘরের গ্যালারীতে স্থাপিত প্রদর্শনীবস্তুসমূহ একক ও দলগতভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।

- জনসাধারণের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি শনিবার ও রবিবার সূর্যাস্তের পর থেকে আকাশ মেঘমুক্ত থাকা সাপেক্ষে দুই ঘন্টাব্যাপী শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে চাঁদ, শুক্রগ্রহ, মঙ্গলগ্রহ, শনিগ্রহ, এণ্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি, রিং, নেবুলা, সেভেন সিস্টার্স, জোড়াতারা ও তারার ঝাঁক পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা।
- দেশের বিজ্ঞান ক্লাবগুলোকে সাহায্য, সহযোগিতা ও উৎসাহ দান এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে বিজ্ঞান আন্দোলনকে জোরদার করার ব্যবস্থা নেয়া।
- মিউজু বাসের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে প্রকাশনার ব্যবস্থা করা।
- জাদুঘরের ওয়ার্কশপের সাহায্যে বিদ্যমান প্রদর্শনী বস্তুসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও বিজ্ঞান ক্লাব সদস্য ও তরুণ বিজ্ঞানীদের জন্য কারিগরি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।
- তরুণ ও অপেশাদার বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত প্রকল্পের মান উন্নয়নে আর্থিক সহযোগিতা করা।
- বিশ্ব বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষে শিশু-কিশোরদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাসহ বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা।
- শিশু-কিশোর ও তরুণদের মধ্যে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উদ্ভাবনমূলক কাজে আগ্রহ সৃষ্টি ও তাদের সুপ্ত প্রতিভা উন্মেষে সহায়তা দান, সর্বস্তরে বিজ্ঞান অনুরাগ ও বিজ্ঞান সাক্ষরতা সৃষ্টি এবং বিজ্ঞানের সুফল দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগের জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর প্রথমে আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিটি জেলা কেন্দ্রে এবং পরে ঢাকায় কেন্দ্রীয় পর্যায়ে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের আয়োজন করা।

তিমির কঙ্কাল

- উৎসাহী পাঠক, ছাত্র-ছাত্রীদের ও গবেষকবৃন্দের জন্য নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান জাদুঘরের গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করা।
- নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক ভিডিও শো, জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা, সেমিনার কুইজ প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞান সম্পৃক্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- খেলার আনন্দে বিজ্ঞানকে সহজে দেখানোর প্রয়াস নেয়া।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ :

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক বাস্তবধর্মী ধারণা দিয়ে সর্বস্তরে বিজ্ঞান অনুরাগ ও বিজ্ঞান সাক্ষরতা সৃষ্টি এবং বিজ্ঞানের সুফল দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগের জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা;
- শিশু-কিশোর ও তরুণদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উদ্ভাবনমূলক কাজে আগ্রহ সৃষ্টি ও তাদের সুপ্ত প্রতিভা উন্মেষে সহায়তা দান;
- দেশীয় সম্পদের সাহায্যে স্বল্পমূল্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক আমদানীর বিকল্প লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে

তরুণ উদ্ভাবক এবং অন্যান্যদের সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান।

অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা :

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞান মেলা দু'টি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয় –

- আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিটি জেলা কেন্দ্রে এবং
- কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ঢাকায়।

আঞ্চলিক পর্যায়ের অনুষ্ঠান ও বিজ্ঞান মেলা ঃ আঞ্চলিক পর্যায়ের অনুষ্ঠানে জেলায় অবস্থিত সকল উপজেলা/থানার হাইস্কুল/মাদ্রাসা, সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যগণ জুনিয়র গ্রুপে এবং কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, বিজ্ঞান ক্লাবের সমমানের সদস্যগণ ও উদ্ভাবনে আগ্রহী অপেশাদার ব্যক্তিবর্গ সিনিয়র গ্রুপে প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে থাকে।

কেন্দ্রীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান ও বিজ্ঞান মেলা ঃ আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় প্রতিটি কেন্দ্রে অংশগ্রহণকারী জুনিয়র, সিনিয়র ও বিশেষ গ্রুপের ১ম স্থান অধিকারী প্রতিযোগীর প্রজেক্ট ঢাকায় কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত হয়।

কেন্দ্রীয় পর্যায়ের কর্মসূচী প্রধানত ৩টি ভাগে বিভক্ত ঃ (১) প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞান প্রদর্শনী; (২) সিম্পোজিয়াম ও আলোচনা সভা; এবং (৩) বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব প্রদর্শনী।

প্রকাশনাসমূহ : ত্রৈমাসিক 'নবীন বিজ্ঞানী' পত্রিকা, জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতামালার গ্রন্থ, জাতীয়

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের বার্ষিক প্রতিবেদন, তরুণ ও অপেশাদার বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত প্রকল্প 'উদ্ভাবন' ও বাৎসরিক বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর প্রকাশিত পোস্টার, ফোল্ডার, লিফলেট প্রকাশ।

শিক্ষা কার্যক্রম : জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর একটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর বিভিন্ন বিষয়ে জনপ্রিয় বক্তৃতা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কসপের আয়োজন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যবৃন্দ, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বিপুল সংখ্যক বিজ্ঞানামোদী শ্রোতার সমাবেশ ঘটে। দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞান শিক্ষকবৃন্দ অনুষ্ঠানসমূহে বিশেষজ্ঞ বক্তা হিসেবে নির্ধারিত বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

ওয়ার্কশপ : জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে একটি আধুনিক ওয়ার্কশপ আছে। সাধারণ কর্মকাণ্ডে এটি ব্যবহৃত হলেও এর বিশেষ উদ্দেশ্য হলো প্রদর্শনী বস্তু তৈরী ও মেরামত ও সংরক্ষণ করা। যে ধরনের কাজ সাধারণত এখানে সম্পন্ন করা হয়–তার মধ্যে রয়েছে মেশিনিং, ওয়েল্ডিং, কার্পেন্টারিং ইত্যাদি। আর একটি উদ্দেশ্য হলো বিজ্ঞান ক্লাব সদস্য ও তরুণ বিজ্ঞানীদের জন্য কারিগরি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।

সায়েন্স পার্ক : সায়েন্স পার্কে লিভার রিডিউস ইফোর্ট, কোন রান্‌স আপ হিল, মিউজিক্যাল টিউব

আর্কিমেডিস স্ক্রু, লিফ্‌ট ইওরসেল্‌ফ, সিম্প্যাথেটিক সুইং, ঘাস ফড়িং, সুইং পেন্ডুলাম, যুদ্ধ বিমান, প্রদর্শনীবস্তুসমূহ রয়েছে।

গ্রন্থাগার : জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে মাঝারী আকারের একটি বিশেষ ধরনের গ্রন্থাগার রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত প্রচুর বই-এর সংগ্রহ রয়েছে এই গ্রন্থাগারে। এসবের মধ্যে বিজ্ঞান ও

প্রযুক্তিভিত্তিক বেশ কিছু এনসাইক্লোপিডিয়া। তাছাড়া রয়েছে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, জ্যোতির্বিজ্ঞান, বিজ্ঞান কল্পকাহিনী, লাইফ সায়েন্স ইত্যাদি তাছাড়াও রয়েছে চলতি ঘটনা প্রবাহের ওপর জার্নাল ও পিরিয়ডিক্যাল্‌স। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের জন্য এই গ্রন্থাগার অফিস চলাকালীন সময়ে খোলা থাকে। সাধারণত ছাত্রছাত্রী ও গবেষকবৃন্দ এই গ্রন্থাগারের পাঠক। এটি সবার জন্য উন্মুক্ত।

লেখক পরিচিতি : প্রাক্তন ও.এস, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্ত জাদুঘর, ঢাকা

এ্যালবাম

৩৬তম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলা

২০১৫

এ্যালবাম

৩৬তম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলা

২০১৫

এ্যালবাম

৩৬তম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ এবং বিজ্ঞান মেলা

২০১৫

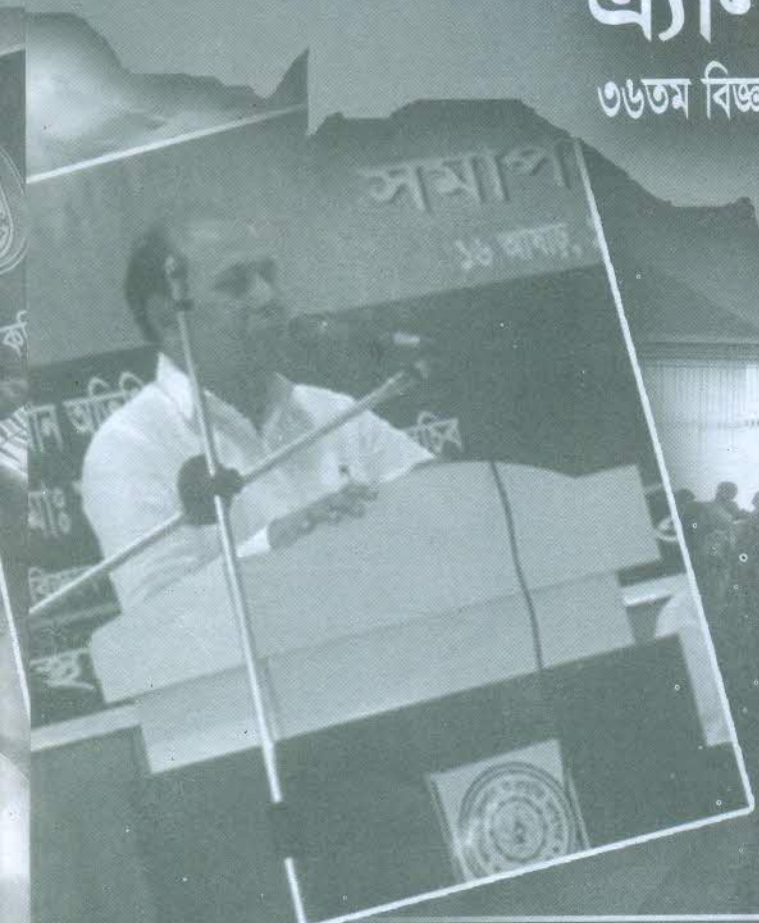

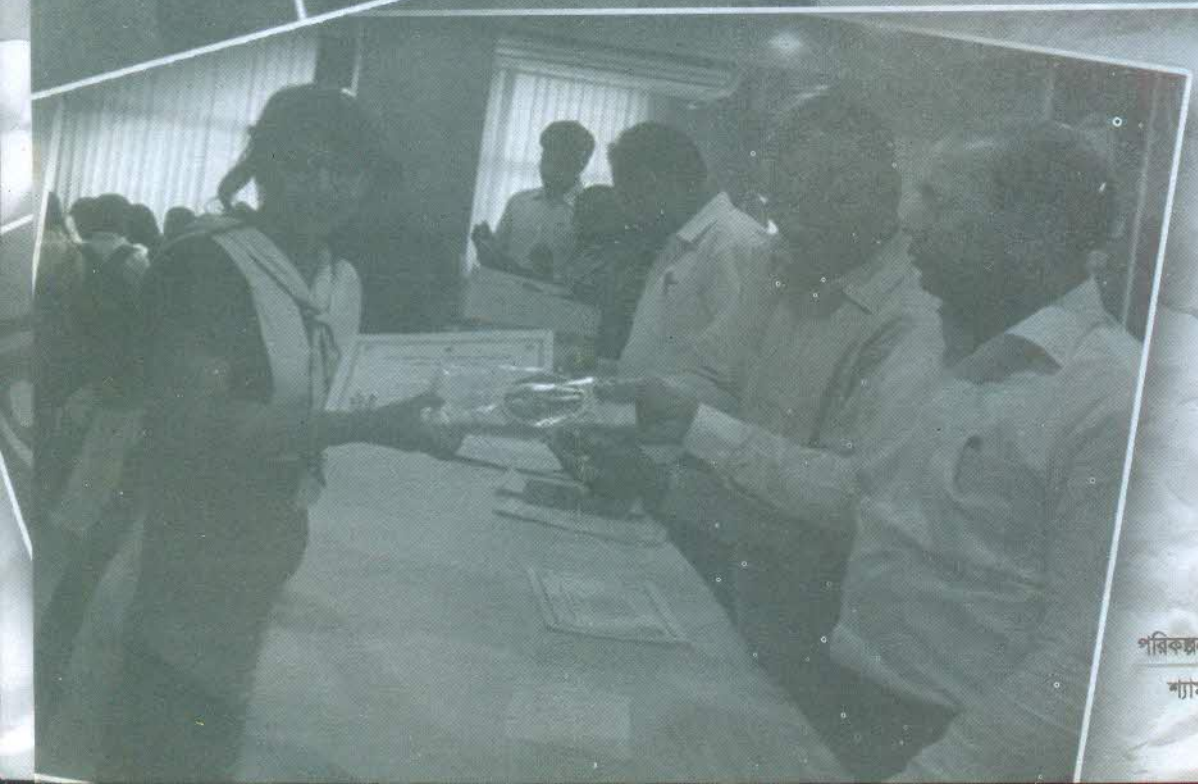

পরিকল্পনা ও ডিজাইন

শ্যামল বসাক

BANSDOC Library
Dhaka

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ হাতে কলমে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রদর্শনীসমূহ সাজানো হয়েছে
- বিজ্ঞান শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান জাদুঘর পরিদর্শন অত্যন্ত আবশ্যক
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠান থেকে দলগতভাবে জাদুঘর পরিদর্শন করতে চাইলে জাদুঘরের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে পরিবহণ (বিশেষ করে ঢাকা শহরে) ও টিকেটে বিশেষ ছাড় এর ব্যবস্থা রয়েছে
- শিক্ষার্থীদের জাদুঘর পরিদর্শন করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জাদুঘর কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো

▶ জাদুঘর গ্যালারী পরিদর্শনের সময়

- শনিবার থেকে বুধবার ঃ সকাল ৯-০০ থেকে বিকাল ৫-০০ (বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার সাপ্তাহিক বন্ধ)

▶ নিম্নোক্ত বিশেষ দিবসসমূহে জাদুঘর গ্যালারী খোলা থাকে

- মহান স্বাধীনতা দিবস, ২৬ মার্চ
- বাংলা নববর্ষ, ১লা বৈশাখ
- মহান বিজয় দিবস, ১৬ ডিসেম্বর
- বড় দিন, ২৫ ডিসেম্বর
- জাতীয় শিশু দিবস, ১৭ মার্চ

জাদুঘরে শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে রাতের আকাশ দেখার ব্যবস্থা রয়েছে

(শনি ও রবিবার সন্ধ্যার পর ১ ঘন্টা, আকাশ মেঘমুক্ত থাকা সাপেক্ষে)

উপভোগ করুন স্বল্পদৈর্ঘ্য
4D Movie

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন
www.nmst.gov.bd

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ফোনঃ ৯১১২০৮৪, ৯১১৪১২৮